বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

www.parwana.net

ফেব্রুয়ারি ◆ ২০২১

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)'র

আত্‌তানভীর

[তাফসীরুল কুরআন]

নিয়মিত

- জীবন জিজ্ঞাসা
- একনজরে গত মাস
- বিজ্ঞান
- জানার আছে অনেক কিছু
- ক্যারিয়ার
- আবাবীল ফৌজ
- কবিতা
- চিঠিপত্র

এ সংখ্যায় রয়েছে...

- আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)
- কুরআনে নবী-শ্রেষ্ঠত্বের অনুষঙ্গ: পরিপ্রেক্ষিত সূরা বাকারা
- সমকালীন দাঈদের দৃষ্টি আকর্ষণ
- ব্যভিচার প্রতিরোধে করণীয়
- মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে ফকীহগণের মর্যাদা
- সৌদি-কাতার ও সৌদি-তুরস্ক সম্পর্কে নতুন সম্ভাবনা
- উজবেকিস্তানে ওলী-আউলিয়ার পাশে
- দেশে দেশে ভাষার লড়াই
- একজন অমুসলিমের সাথে আলাপচারিতা
- তালামীযে ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী : আমার অনুভূতি
- কিভাবে গড়বেন আপনার সন্তানকে

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
২৮তম বর্ষ ■ ২য় সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০২১ ♦ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৭ ♦ জমা. সানী-রজব ১৪৪২

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
আখতার হোসাইন জাহেদ

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মোখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

সহ-সম্পাদক
মুহাম্মদ উসমান গণি
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

সার্কুলেশন ম্যানেজার
এস এম মনোয়ার হোসেন

কম্পোজ ও প্রচ্ছদ ডিজাইন
পরওয়ানা গ্রাফিক্স

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা)
২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল
ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ২৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

শারহুল হাদীস
ঈমান, ইসলাম ও ইহসান/মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ০৬

সাহাবা
আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)/মাওলানা মো. নজমুদ্দীন চৌধুরী ০৯

শানে রিসালাত
কুরআনে নবী-শ্রেষ্ঠত্বের অনুষঙ্গ: পরিপ্রেক্ষিত সূরা বাকারা/আব্দুল্লাহ বিন সিদ্দিক আল গুমারী (র.)
অনুবাদ: সাঈদ হুসাইন চৌধুরী ১১

ফিকহ
মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে ফকীহগণের মর্যাদা/মো. মুহিবুর রহমান ১৩

প্রবন্ধ
কুরআন-সুন্নাহ-এর আলোকে দাঈর গুণাবলি
সমকালীন দাঈদের দৃষ্টি আকর্ষণ/অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ১৫
ব্যভিচার প্রতিরোধে করণীয়/মোস্তফা মনজুর ১৮
রাসূল ﷺ এর প্রতি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর ভালোবাসা/মোহাম্মদ খছরুজ্জামান ২২
দেশে দেশে ভাষার লড়াই/মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ২৩

আলোকপাত
তালামীযে ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী : আমার অনুভূতি/মুহাম্মদ আব্দুন নূর ২৪

স্মরণ
ঐতিহাসিক ভাষ্যে উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার: খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর অবদান/মাসুক আহমেদ ২৬

আন্তর্জাতিক
সৌদি-কাতার ও সৌদি-তুরস্ক সম্পর্কে নতুন সম্ভাবনা/রহমান মোখলেস ২৮

ইতিহাস-ঐতিহ্য
আন্দালুস! হারানো ঐতিহ্য, আমাদের আফসোস/আহসান হাবীব শাহ ৩০
সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ উম্মাহ দরদী এক উসমানী খলীফা/হায়দার ইবনে মোকাররাম ৩৫

সফরনামা
উজবেকিস্তানে ওলী-আউলিয়ার পাশে/মারজান আহমদ চৌধুরী ৩৮

অনুভূতি
একজন অমুসলিমের সাথে আলাপচারিতা/মুহাম্মদ সুফিয়ান বিল্লাহ ৪০

গ্রন্থ পরিচিতি
পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ স্মারক 'সুবহে সাদিক'/আবদুল মুকীত চৌধুরী ৪১

খাতুন
কিভাবে গড়বেন আপনার সন্তানকে/শামীমা জাফরিন ৪২

নিয়মিত
জীবন জিজ্ঞাসা ৪৩
একনজরে গত মাস ৪৮
জানার আছে অনেক কিছু ৫১
বিজ্ঞান ৫২
ক্যারিয়ার ৫৩
কবিতা ৫৪
আবাবীল ফৌজ ৫৬
চিঠিপত্র ৬৪

সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

نحمده ونصلى على رسوله الكريم– اما بعد

ভারত উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাসে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি ৫৩৭ হিজরীতে ইরানের সীতান অঞ্চলের সানজার নামক মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ ও তরীকার ইমাম ছিলেন। দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ৫৬১ হিজরীতে তিনি এ উপমহাদেশের আজমীর শরীফে আগমন করেন। ঐতিহাসিক ভাষ্যে পাওয়া তথ্য মতে তার হাতে প্রায় ৯০ লক্ষ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কুফর ও শিরকে নিমজ্জিত ভারতে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল তাঁরই মাধ্যমে। এতদঞ্চলে মুসলিম সালতানাত-সাম্রাজ্যের উপর তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ছিল। মানুষের আত্মিক সংশোধন ও আদর্শ গুণাবলির বিকাশে তাঁর প্রবর্তিত চিশতিয়া তরীকার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে এ উপমহাদেশে যে সকল বুযুর্গ ইসলামের ধারক-বাহক ছিলেন তাদের সিংহভাগই চিশতিয়া তরীকায় দীক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। ভারত উপমহাদেশের এমন কোনো অঞ্চল নেই যেখানে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর খলীফাগণের কেউ না কেউ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যাননি। প্রায় শতবর্ষী জীবন অতিবাহিত করে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তাঁর ইন্তিকালের সন ও তারিখ নিয়ে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের বর্ণনামতে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিল ৬ রজব, সোমবার। উপমহাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আল্লাহ তাঁর এ ওলীর সিলসিলাকে কিয়ামত পর্যন্ত জারী রাখুন। আমীন।

...

ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষা আন্দোলনের মাস। ১৯৫২ সালের এ মাসে রাষ্ট্রভাষা বাংলা'র স্বীকৃতি আদায়ের জন্য আত্মদান করে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছিলেন রফিক, সালাম, বরকত, আব্দুল জব্বারসহ আরো অনেকে। ফলশ্রুতিতে ১৯৫৪ সালের ৭ মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। বাঙ্গালীদের আত্মদানের স্বীকৃতস্বরূপ ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা দান করে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা দানের জোরালো দাবি জানানো হচ্ছে। মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুসারে বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা দান সময়ের দাবি।

ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষা আন্দোলনের মাস। ১৯৫২ সালের এ মাসে রাষ্ট্রভাষা বাংলা'র স্বীকৃতি আদায়ের জন্য আত্মদান করে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছিলেন রফিক, সালাম, বরকত, আব্দুল জব্বারসহ আরো অনেকে।

ফলশ্রুতিতে ১৯৫৪ সালের ৭ মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়।

আত্ তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ– الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ– مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সকল সৃষ্টির পালনকর্তা। পরম দয়ালু ও অসীম করুণাময়। যিনি বিচার দিনের মালিক।

সূরা ফাতিহার নাম

সূরা ফাতিহার বেশ কয়েকটি নাম আছে। প্রায় সকল নাম থেকেই এ সূরার মর্যাদার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন-

১. فاتحة الكتاب: এ নামকরণের কারণ হচ্ছে- যেহেতু এ সূরা দিয়ে কুরআন কারীম শিক্ষা ও নামাযের কিরাত শুরু করা হয় এবং প্রত্যেক কিতাবের শুরুতেই সূরা ফাতিহা দিয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা হয়। যেমনিভাবে কুরআনের শুরুতেই সূরা ফাতিহা রয়েছে।

২. سورة الحمد: কারণ এ সূরার শুরু **الحمد** শব্দ দিয়ে করা হয়েছে।

৩. أُمُّ الْكِتَاب وَأُمُّ الْقُرْآن: যেহেতু এটি কুরআনের আসল এবং প্রত্যেক আসমানী কিতাবের আসল। কারণ এ সূরায় আল্লাহ তাআলার একত্ব, শেষ বিচারের দিনের কথা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে অথবা এ জন্যে যে, এ সূরা সকল আসমানী কিতাবের সার। অথবা এজন্য যে, এতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যে নিয়োজিত থাকা, মুকাশাফা ও মুশাহাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে। বা এ জন্যে যে, সকল ইলমের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার আল্লাহর রবুবিয়াতের মহত্ত্ব ও বান্দাহ'র অসহায়ত্ব অনুধাবন করা। আর এ বিষয়টি এ সূরায় উল্লেখ রয়েছে। অথবা হয়তো এ জন্য **ام الكتاب** বা **ام القران** রাখা হয়েছে যে, এ সূরা কুরআনের সকল সূরার মধ্যে সর্বোত্তম। যেমন, মক্কা মুয়ায্যামাকে **ام القري** অর্থাৎ গ্রামের মধ্যে সর্বোত্তম গ্রাম বা মূল বলা হয় এটি জনপদগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা সকল জনপদের মূল হওয়ার কারণে।

৪. سبع المثاني: সূরা ফাতিহাকে **سبع المثاني** বলা হয়, কারণ এ সূরাটি সাত আয়াত বিশিষ্ট। অধিকন্তু এ সূরা প্রত্যেক নামাযের মধ্যে অবশ্যই দুবার পড়তে হয় (অর্থাৎ নামাযের প্রথম দুই রাকাতে অবশ্যই পড়তে হয়)। বা এ সূরার প্রথম অংশ বান্দাহ কর্তৃক আল্লাহর প্রশংসা আর শেষ অংশ বান্দাহর তরে আল্লাহর দান। অথবা এটি এই উম্মতের জন্য বিশেষভাবে নাযিলকৃত। রাসূল ﷺ বলেন, কসম ঐ যাতের, যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ, সূরা ফাতিহার মতো মূল্যবান সূরা তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবূরের মধ্যে নাযিল করা হয়নি। এটি **سبع المثاني** ও কুরআনে আযীম।[১] অথবা এ সূরা দুবার নাযিল হয়েছে বা এ সূরায় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা হয়েছে এজন্য এই নাম রাখা হয়েছে।

৫. وافية: এ শব্দের অর্থ পূর্ণ। যেহেতু নামাযের মধ্যে পূর্ণ সূরাটি পাঠ করা ওয়াজিব। এ সূরা ছাড়া অন্য সূরা পড়লে নামায পূর্ণ হবে না।

৬. الكافيه: এ শব্দের অর্থ হচ্ছে সম্পূরক। কারণ এ সূরা অন্য সূরার সম্পূরক হতে পারে কিন্তু অন্য সূরা এ সূরার সম্পূরক হতে পারে না।

৭. الشفاء والشافية: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রোগের শিফা বা প্রতিষেধক।[২]

৮. اساس: এ শব্দের বাংলা অর্থ হলো মূল ভিত্তি। যেহেতু এটি কুরআন পাকের প্রথম সূরা বা মূল বিষয়ের মতো বা এ সূরা সমস্ত ইবাদতের মূল। ইমাম শা'বী (র.) বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, পবিত্র কুরআন হচ্ছে অন্যান্য সকল কিতাবের اساس বা ভিত্তি। আর কুরআনের মূল হচ্ছে ফাতিহাতুল কিতাব অর্থাৎ সূরা ফাতিহা। আর সূরা ফাতিহার মূল হলো بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ যখন তুমি অসুস্থ হবে বা তোমার অন্য কোনো অসুবিধা হবে, অবশ্যই তুমি اساس পাঠ করবে, আল্লাহর হুকুমে ভালো হয়ে যাবে।[৩]

৯. سورة الصلوة: নবী করীম ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, **الصلوة** অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে আমার ও আমার বান্দাহর মধ্যে দু'অংশে বিভক্ত করেছি।'[৪] কোনো বস্তুর অধিকাংশের ভিত্তিতে তার নাম রাখার রীতি থেকে এ নাম রাখা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।

১০. سورة تعليم المسئلة: যেহেতু এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাহকে কীভাবে চাইতে হয় সে পদ্ধতি শিক্ষা প্রদান করেছেন। এ সূরা প্রথমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে। তারপর দুআর মধ্যে ইখলাস অর্থাৎ লোক দেখানো বা রিয়া থেকে মুক্ত রাখার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

১১. سورة الكنز: হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা ফাতিহা আরশে আযীমের ভাণ্ডার থেকে মক্কা শরীফে নাযিল করা হয়।

হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে, সূরা ফাতিহা মক্কী সূরা। যারা এ সূরাকে মাদানী সূরা বলেন, তাদের কথার সামঞ্জস্য বিধান করা যায় এভাবে, এ সূরা দু'বার অবতীর্ণ হয়। তবে দু'বার অবতীর্ণ হয়েছে বলে মুতাওয়াতির কোনো প্রমাণ নেই।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

(সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সকল সৃষ্টির পালনকর্তা)

আলহামদুলিল্লাহ'র মহত্ত্ব

বিসমিল্লাহর বরকতে জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এর বরকতে জান্নাতের দরজাগুলো খোলে যায়। যেহেতু, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এ আটটি হরফ বা বর্ণ রয়েছে। জান্নাতের দরজাও আটটি। তাছাড়া মানুষের প্রথম বাক্যই হচ্ছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ।

হযরত আদম (আ.) এর রূহ যখন নাভী পর্যন্ত পৌঁছেছিল, তখন তিনি হাঁচি দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ।[৫]

জান্নাতবাসীদের শেষ চাহিদাও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ।

এ বিশ্বজগতের সূচনার ভিত্তিও হচ্ছে **حمد** অর্থাৎ প্রশংসার উপর। সুতরাং প্রত্যেক কাজের শুরু এবং শেষ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দিয়ে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সূরা ফাতিহার মধ্যে সাত আয়াত। মানব সৃষ্টির বিবর্তন ও উন্নয়ন সাতটি স্তরের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ– ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ– ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

-আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।[৬]

এ কারণে মানুষের উন্নতির সর্বোত্তম মাধ্যম হলো সূরা ফাতিহা।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (পরম দয়ালু ও অসীম করুণাময়)

রাহমান ও রাহীম শব্দদ্বয় বিশ্বজগতের জন্য দয়া ও করুণার কারণ। সুতরাং যে কষ্ট এবং বালা-মুসিবত দুনিয়াতে হয়ে থাকে তাও প্রকৃতপক্ষে রাহমাত আর নিআমত। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন, عَسٰى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسٰى أَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ 'হতে পারে তোমরা যা অপছন্দ কর তার মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত আর যা তোমরা পছন্দ কর, হয়তো তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর।'[৭] এ বিষয়ের ক্ষেত্রে মূসা এবং খিযির (আ.) এর ঘটনা প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে রাহমাত উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এ জন্যই তিনি নিজের দাঁত মুবারক শহীদ হওয়া সত্ত্বেও দুঃখ না করে সানন্দে বলেছিলেন, اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ 'আল্লাহ, আমার কাওমকে হিদায়াত দান করুন। কারণ তারা জানে না।'[৮] আর তিনি কিয়ামতের দিন বলতে থাকবেন, امتي، امتي আমার উম্মত, আমার উম্মত।

আল্লাহ তাআলা নিজ সত্তাকে 'রাহমান' এবং 'রাহীম' শব্দ দ্বারা বিশেষিত করেছেন। তা থেকে বুঝা যায় একবার রহমত করার মাধ্যমে মানুষ সংশোধন হবে না। (আল্লাহ যেন বলছেন) আমাকে এবং আমার বান্দাকে ছেড়ে দাও। আমার রহমত অসীম। পক্ষান্তরে বান্দাহ'র গোনাহ সসীম। যেভাবে সসীম অসীমের মধ্যে ডুবে যায়, এভাবে বান্দাহ'র গোনাহ আল্লাহর রহমতের সাগরে ডুবে যায়। এ জন্যই আল্লাহ বলেন, وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى 'আপনার রব অচিরেই আপনাকে এমন দান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।'[৯]

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন, আমি এক সম্প্রদায়ের মেহমান হয়েছিলাম। আমার জন্য খাবার আনা হলো। একটি কাক এ খাবার থেকে একটি রুটি নিয়ে গেল। দেখলাম এই রুটিখানা একটি টিলার উপর হাত-পা বাঁধা এক ব্যক্তির মুখে নিয়ে দিল।

হযরত যুননুন বলেন, আমি এক ঘরে ছিলাম। হঠাৎ আমার ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার খেয়াল আসল। আমি ঘর থেকে বের হয়ে নীল নদের কাছে পৌঁছলাম। সেখানে দেখলাম একটা বিচ্ছু এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি করছে। যখন বিচ্ছু নীল নদের কাছে আসল, তখন একটি ব্যাঙ নীল নদের তীরে আসল এবং বিচ্ছুটি ব্যাঙের পিঠে উঠল আর নীল নদের পানিতে সাঁতার কাটতে লাগল, আমিও একটি নৌকা নিয়ে বিচ্ছুর পিছু ছুটলাম। যখন ব্যাঙ নীল নদের তীরে উঠল, বিচ্ছু ব্যাঙের পিঠ থেকে নেমে দৌড়াতে লাগল। আমিও পিছু ছুটলাম। দেখলাম একটি বৃক্ষের নিচে এক যুবক ঘুমাচ্ছিল এবং এ যুবকের নিকট একটি সাপ তাকে কামড় দেবার মনস্থ করছিল, যখনই সাপ একেবারে ওই যুবকের নিকটবর্তী হচ্ছিল, তখনই ওই বিচ্ছু সাপের কাছে গিয়ে সাপকে কামড়ে দিল এবং সাপও বিচ্ছুকে কামড় দিল। ফলে উভয়ে একসাথে মারা গেল।

আরববাসী দুআর সময় বলতেন, يَا رَازِقَ النَّعَّابِ فِي عُشِّهِ 'হে কাকের বাচ্চার মুখে রিযিক পৌঁছিয়ে দানকারী।' ঘটনা হলো, কাকের বাচ্চা ডিম থেকে বের হওয়ার পর সাদা একটা গোশতের টুকরার মতো দেখায়। কাক বাচ্চার রঙ তার নিজের রং এর বিপরীত দেখে ঘৃণাভরে বাচ্চাদের ছেড়ে চলে যায়। হযরত ইমাম দামীরী লিখেন, দু থেকে এগারো দিন যখন বাচ্চা এভাবে একা পড়ে থাকে, এ সময়ের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বাচ্চাগুলোর শরীরে এক প্রকার গন্ধ সৃষ্টি করে দেন, এতে মাছি এদের চারপাশে ঘিরে বসে, বাচ্চাদের মুখের ভিতর আরো বেশি গন্ধ হয় আর বাচ্চাগুলো মুখ খোলে রাখে, মাছি কাকের বাচ্চার মুখে ঢুকে আর কাকের বাচ্চারা তা খেতে থাকে। এভাবে পাখা গজিয়ে উঠা পর্যন্ত চলতে থাকে। এরপর যখন কাকের বাচ্চার শরীরে পাখা গজিয়ে রং কালো হয়, তখন এদের মা তাদের কাছে আসে।

বর্ণিত আছে, এক সাহাবী মুমূর্ষ অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তার মুখ দিয়ে لا اله الا الله বের হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ ব্যাপারে অবহিত করা হলো। তিনি তাকে তালকীন করতে লাগলেন কিন্তু তার মুখ দিয়ে কালিমা বের হচ্ছিল না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এ লোক কি নামায পড়ত না? এ লোক কি যাকাত দিত না? এ লোক কি রোযা রাখত না? তখন সকলে জবাব দিলেন, হ্যাঁ সবকিছু করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন, এ লোক কি নিজের মায়ের নাফরমানী করত? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার মাকে ডাক। এরপর এক বৃদ্ধা অন্ধ মহিলাকে ডাকা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃদ্ধা মহিলাকে বললেন, হে বৃদ্ধা! তুমি কি একে ক্ষমা করবে না? বৃদ্ধা জবাব দিলেন, আমি কখনো একে ক্ষমা করবো না। কারণ এ আমাকে চড় মেরে আমার এ চোখ নষ্ট করে দিয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তাহলে আগুন এবং লাকড়ী আন। এতে বৃদ্ধা রাসূলুল্লাহ ﷺকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আগুন আর লাকড়ী দিয়ে কি করবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, একে তোমার সামনেই আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেব; সে তার কাজের ফল পাবে। এ কথা শুনে বৃদ্ধা বললেন, আমি তাকে মাফ করে দিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তাকে আগুনে পোড়ানোর জন্যই কি আমি নয় মাস উদরে রেখেছিলাম? আগুনে পোড়ানোর জন্যই কি তাকে দু'বছর দুধ পান করিয়েছিলাম? তাহলে মা এর রহমত বলতে আর কি রইলো? সাথে সাথে ওই লোকের মুখ খুলে বের হলো, لا اله الا الله এ তো শুধু মায়ের দয়া থেকেই হয়েছে। মায়ের দয়ায় যদি আগুনের পোড়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহলে رحمٰن رحيم এর দয়ার বিস্তৃতি কত মহীয়ান হবে তা সহজেই অনুমেয়। তিনি কিভাবে তার বান্দাহকে আগুনে পোড়াবেন- যার মুখ দিয়ে ৭০ বছর পর্যন্ত অবিরত رحمٰن رحيم অনুশীলন হতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলার একশত রহমত রয়েছে। তন্মধ্যে একশত ভাগের এক ভাগ রহমত এ পার্থিব সৃষ্টি জীব তথা মানুষ, জিন, পশু-পাখি, জানোয়ার সকলকে দান করেছেন। এর ভিত্তিতেই তারা পরস্পরের প্রতি রহম করেন। আর ৯৯ ভাগ রহমত দ্বারা কিয়ামতের দিন তিনি তার বান্দাদের রহম করবেন।[১০] আল্লাহ তাআলার করুণার সীমা নেই আর রহমতের শেষ নেই।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (যিনি বিচার দিনের মালিক)

আদালত বা ন্যায়পরায়ণতার অর্থ হচ্ছে, ভালো আর খারাপের মধ্যে পার্থক্য করা, কৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন, অনুকূল ও প্রতিকূলের মধ্যে পার্থক্য করা, সীমারেখা টানা। এগুলো বিচারের দিবস ছাড়া হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ

-কিয়ামত নিকটবর্তী ও আসন্ন। আমি তা গোপন রাখতে চাই যাতে

প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল অনুযায়ী তার ফল পেতে পারে। [১১]

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, কিয়ামতের দিন এক লোককে বিচারের জন্য আনা হবে, সে তার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখবে কিন্তু তার একটা নেকীও খোঁজে পাবে না। এরপর গায়িবী আওয়াজ আসবে! হে আল্লাহর বান্দাহ! তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। এতে ওই ব্যক্তি বলবে রব, আমি কী আমল করেছি, যার কারণে বেহেশতে প্রবেশ করব! আল্লাহ তাআলা উত্তর দেবেন, যখন তুমি রাত্রে ঘুমাতে, তখন এপাশ ওপাশ হওয়ার সময় আল্লাহ বলেছিলে। তারপর ঘুমের মধ্যে তা ভুলে গিয়েছিলে; কিন্তু আমার তো ঘুম নেই, তাই আমি তা ভুলিনি। অপর এক লোককে উপস্থিত করা হবে। তার নেকী আর পাপ ওজন করা হবে, তার নেক কাজগুলো হালকা হয়ে যাবে। তারপর একটা কার্ড দেওয়া হবে, যাতে لا اله الا الله লিখা থাকবে যার কারণে নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে।[১২] মোট কথা আল্লাহ তাআলা মহান, তাঁর মহত্বের গুণেই ক্ষমার আশা করা যায়। কারণ তিনি এ বিশ্ব ভূমণ্ডলের মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু বান্দাহর হক থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। কেননা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুফলিস অর্থাৎ গরীব কে তা জানো? আমরা সাধারণত মনে করি মুফলিস বা গরীব সে ব্যক্তি, যার দিরহাম বা আনন্দ উপভোগ করার মতো সামগ্রী নেই। কিন্তু আসলে তা নয়। মুফলিস বা দরিদ্র সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যার নামায, যাকাত ও রোযা সবকিছু হাজির করা হবে। কিন্তু এর সাথে হাজির করা হবে অমুককে সে গালি দিয়েছে, অমুককে অপবাদ দিয়েছে, অমুকের মাল আত্মসাৎ করেছে, অমুকের রক্তপাত ঘটিয়েছে, অমুককে প্রহার করেছে। তখন তার পূণ্য থেকে এদের সবাইকে প্রদান করা হবে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে তার সকল নেকী শেষ হয়ে যাবে। তখন পাওনাদারের পাপ ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে। তারপর তাকে দুযখে নিক্ষেপ করা হবে।[১৩]

مالك শব্দের মধ্যে আলিফ অতিরিক্ত ব্যবহার করার রহস্য হলো, কিয়ামতের দিন অনেকেই মালিক হবে কিন্তু শেষ অবধি আল্লাহ তাআলার মালিকানা ছাড়া কারো মালিকানা থাকবে না। ملك আর مالك শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো ملك শব্দের মধ্যে ভয়-ভীতি ও কার্য কৌশলের অর্থ আছে, অন্যদিকে مالك শব্দের মধ্যে নম্রতা ও করুণার অর্থ রয়েছে। অধিকন্তু مالك বলা হয় রাজত্বের অধিকারী হওয়াকে। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ– وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ– 'বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর।'[১৪]

এখানে مالك দ্বারা সাম্রাজ্যের মালিক তথা সম্রাটকে বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে কোনো বিষয়ে একক কর্তৃত্বের অধিকারীকে বলা হয় ملك। যেমন বলা হয়েছে- لا ملك الا هو অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে তিনি ছাড়া কর্তৃত্ববান আর কেউ নেই। আল্লাহ তাআলার বাণী, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (আজকের কর্তৃত্ব কার? এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহর) এবং اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ (সে দিনের সত্যিকার কর্তৃত্ব করুণাময় আল্লাহর থাকবে)। এ আয়াতসমূহে مالك বলতে কর্তৃত্ব বুঝানো হয়েছে রাজত্ব নয়। উল্লেখ্য যে, দুনিয়ার রাজত্বের জন্য যোগ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা আবশ্যক, কারণ এর উপরই জীবন সুখী হওয়া নির্ভর করে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ "নর-নারী যেই হোক যদি ভালো কাজ করে এমতাবস্থায় যে সে মুমিন, আমি তাকে উত্তম জীবন দান করব, তাকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করব।"[১৫]

এর প্রমাণস্বরূপ একটা উদাহরণ প্রদান করা হলো, বাদশাহ নওশিরওয়ান একদিন শিকার করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে নিজ সৈন্য থেকে পৃথক হয়ে পড়লেন। তিনি খুবই তৃষ্ণার্ত হলেন। তিনি বনের ভিতর আনারের একটি বাগান দেখলেন। বাগানে প্রবেশ করে এক বালককে বললেন, আমাকে একটা আনার দাও। সে আনার দিল। আনার ভেঙে তিনি সুস্বাদু নির্যাস বের করে তা পান করলেন। অতঃপর তাঁর এ বাগান পছন্দ হলো। তিনি মালিকের নিকট থেকে বাগান নিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। তারপর বালকটিকে বললেন, আমাকে আরও একটা আনার দাও। বালক আরও একটি আনার দিল। যখন ওটা ভাঙলেন, কিছু নির্যাস বের হলো এবং তা পান করলেন, কিন্তু টক পেলেন। তিনি বালকটিকে বললেন, হে বালক, আনারের এ অবস্থা কেন? বালকটা বললেন, সম্ভবত এ দেশের বাদশাহ অত্যাচারের সংকল্প করেছেন, তার অত্যাচারের মন্দ প্রভাবে আনারের ঐ অবস্থা। সেই সময়েই নওশিরওয়ান মনে মনে তাওবাহ করে নিলেন এবং বালককে বললেন, আরও একটা আনার দাও, যখন ওই তৃতীয় আনারটা ভাঙলেন এবং নির্যাস বের করলেন, আগেরটার চেয়ে আরো ভালো ও সুস্বাদু পেলেন। তখন বালকটিকে বললেন, এখনতো অবস্থার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বালক জবাব দিল, সম্ভবত বাদশাহ তার ধারণা থেকে তাওবাহ করেছেন। যখন বাদশাহ বালকটার কথার সঙ্গে নিজের ধ্যান-ধারণার মিল খোঁজে পেলেন, তখন সম্পূর্ণভাবে তাওবাহ করলেন। এমনকি তখন থেকে তিনি এমন ন্যায়বান হয়ে গেলেন যে, তার সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের নবী করীম ﷺ তার সম্পর্কে বলেন, এ যামানায় একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ'র আবির্ভাব হয়েছে।

সূরা ফাতিহার মধ্যে আল্লাহ তাআলার পাঁচটি নাম রয়েছে।

১. الله ২. الرب ৩. الرحمٰن ৪. الرحيم ৫. الملك

হয়তো এ শব্দের দ্বারা তিনি এভাবে ইশারা করে বলছেন যে, আমি আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছি। তারপর বিভিন্ন ধরনের নিয়ামতের মাধ্যমে লালন-পালন করেছি সুতরাং আমি রব। এরপর তুমি নাফরমানী করেছ কিন্তু তা আমি প্রকাশ করিনি, যেহেতু আমি রাহমান। এরপর তুমি তাওবাহ করেছ, আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি যেহেতু আমি রাহীম অর্থাৎ তাওবাকারীর তাওবাহ কবূল করে বান্দাহকে ক্ষমা করে দেই। এরপর তোমার আমলের ফল প্রদান করব যেহেতু আমি শেষ বিচারের দিনের মালিক।

আল্লাহ তাআলা যেন বলেছেন, তোমরা আমার যাতে কামালের মহত্ব বর্ণনা করে আমার প্রশংসা কর, কারণ আমিই আল্লাহ। তোমরা আমার ইহসানের জন্য প্রশংসা কর, কারণ আমিই রাব্বুল আলামীন। অনন্তর তোমরা আমার ইহসানের প্রত্যাশা কর যেহেতু আমি রাহমান রাহীম। পক্ষান্তরে আযাবের ভয়ে ভীত হও, যেহেতু আমি শেষ বিচারের দিনের মালিক।

১। আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, কিতাবুত তাফসীর, সূরাতুল ফাতিহা, ২। বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, হা/২৩৭০, ৩। তাফসীরে কুরতুবী, সূরা ফাতিহা, ৪। সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, বাব: উজুবু কিরাআতিল ফাতিহা ফি কুল্লি রাকাআহ.. ৫। তিরমিযী, হা/৩৩৬৮, ৬। সূরা মুমিনুন, আয়াত- ১২-১৪, ৭। সূরা বাকারা, আয়াত-২১৬, ৮। বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ৯। সূরা দুহা, আয়াত-৫, ১০। সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাওবাহ, বাবু ফি সাআতি রাহমাতিল্লাহ..., ১১। সূরা ত্বা-হা, আয়াত-১৫, ১২। তাফসীরে কুরতুবী, সূরা আরাফ, আয়াত: ,... والوزن يومئذ الحق , ১৩। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, বাবু তাহরীমিয যুলম, ১৪। সূরা আল ইমরান, আয়াত-২৬, ১৫। সূরা নহল, আয়াত-৯৭

ঈমান, ইসলাম ও ইহসান

∞ মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

হাদীসের মূলভাষ্য

عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: " بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْنَا مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟. قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ ". رواه مسلم.

অনুবাদ

হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিত ও ঘনকালো চুল বিশিষ্ট একজন লোক আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। তার মধ্যে সফরের কোনো চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল না, আর আমাদের কেউও তাকে পরিচয় করতে পারছিলেন না। এমনকি তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে বসলেন এবং তার দুই হাঁটুকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই হাঁটুর সাথে মিলালেন এবং নিজের দুই হাত তাঁর উরুর উপর রাখলেন আর বললেন: হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবগত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলাম হলো- তুমি একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রামাদানের রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে, যদি তুমি সেখানে পৌঁছতে সমর্থ হও। (উত্তর শুনে) তিনি (প্রশ্নকারী) বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। তার আচরণে আমরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম যে তিনি প্রশ্ন করছেন আবার সত্যায়নও করছেন।

অতঃপর তিনি বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবগত করুন (অর্থাৎ ঈমান কী?)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও আখিরাতের দিনের প্রতি এবং বিশ্বাস করবে তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি। (উত্তর শুনে) তিনি বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন।

অতঃপর তিনি বললেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে অবগত করুন (অর্থাৎ ইহসান কী?)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে (মনে করবে যে) তিনি তোমাকে দেখছেন।

এরপর তিনি বললেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবগত করুন (অর্থাৎ কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক জানেন না। তখন তিনি (প্রশ্নকারী) বললেন, তাহলে এর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দাসী তার মনিবকে জন্ম দিবে এবং নগ্নপদ, উলঙ্গ শরীর, দরিদ্র, মেষ রাখালদের উঁচু দালান নিয়ে গর্ব করতে দেখবে।

অতঃপর ঐ ব্যক্তি (প্রশ্নকারী) চলে গেলে আমরা কিছুক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমর, তুমি কি জানো এই প্রশ্নকারী কে? আমি জবাব দিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি হলেন জিবরীল (আ.)। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য তিনি এসেছিলেন। (মুসলিম)

হাদীস প্রাসঙ্গিক কথা

এ হাদীস যেমন সুদীর্ঘ তেমনি এতে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি একত্রে সন্নিবেশিত। এ হাদীসকে উম্মুস সুন্নাহ বা উম্মুল আহাদীস-সকল হাদীসের মূল বলা হয়। আল্লামা ইবনু দাকীক আল ঈদ (র.) লিখেছেন,

هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة: أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن.

-এটি হলো এমন এক মহান হাদীস, যাতে জাহিরী ও বাতিনী সকল আমলের বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শরীআতের সকল জ্ঞান এ হাদীসের দিকেই প্রত্যাবর্তিত এবং এ হাদীস থেকেই নির্গত। সুন্নাহর সকল জ্ঞান এতে অন্তর্ভুক্ত। এ হাদীস যেন 'উম্মুস সুন্নাহ' তথা সুন্নাহর মূল, যেমন সূরা ফাতিহা হলো উম্মুল কুরআন বা কুরআনের মূল; যেহেতু সূরা ফাতিহার মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআনের মর্মার্থ সন্নিবেশিত। (শরহুল আরাবাঈন)

হাদীসে প্রশ্নকারী কে ছিলেন?

হাদীসের প্রথম অংশে প্রশ্নকারীর পরিচয় গোপন থাকলেও শেষে হযরত উমর (রা.) এর আগ্রহের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিচয় তুলে ধরেছেন যে, তিনি হলেন হযরত জিবরীল (আ.)। হযরত জিবরীল (আ.) মানুষের বেশে রাসূল ﷺ এর দরবারে এসে প্রশ্ন করেছিলেন। এ কারণে হাদীসটি 'হাদীসে জিবরীল' নামে প্রসিদ্ধ।

বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে হযরত জিবরীল (আ.) মানুষের

বেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে আসলে সাধারণত হযরত দাহইয়া কালবী (রা.) এর আকৃতিতে আসতেন। তবে এ হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি একজন অপরিচিত আগন্তুকের বেশে এসেছিলেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চেহারা-সুরত ছিল পরিপাটি।

উল্লেখ্য যে, জিবরীল নামের ক্ষেত্রে জিবরীল এবং জিবরাঈল দুটি লুগাতই সঠিক।

প্রশ্নকারীর সত্যায়ন ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতিক্রিয়া

এ হাদীসে অপরিচিত আগন্তুকের বেশে হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রশ্ন করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জবাব শুনে তা সত্যায়ন করেছেন। এটি ছিল একটি বিরল ঘটনা। ফলে সাহাবায়ে কিরাম এতে আশ্চর্যান্বিত হন, যার বর্ণনা এ হাদীসে রয়েছে। এমনকি বর্ণনাকারী হযরত উমর (রা.) প্রশ্নকারী চলে যাওয়ার পরও তার পরিচয় জানার আগ্রহে দীর্ঘ সময় দরবারে রিসালতে বসা ছিলেন।

হযরত আবূ যর ও আবূ হুরায়রা (রা.) এর বর্ণনায় আছে, আমরা যখন এই ব্যক্তিকে "আপনি ঠিক বলেছেন" বলতে শুনলাম তখন আমরা এরূপ বলা অপছন্দ করলাম। (নাসাঈ)

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, সাহাবায়ে কিরাম বলাবলি করলেন, দেখ সে জিজ্ঞাসা করছে আবার সত্যায়নও করছে। সে যেন আল্লাহর রাসূল থেকে বেশি জানে।

অন্য বর্ণনায় আছে, তারা বললেন, আমরা তো এরূপ কোনো ব্যক্তি দেখিনি। সে যেন আল্লাহর রাসূলকে শেখাচ্ছে। আর বলছে, আপনি ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন!

সারকথা হলো, আগন্তুক প্রশ্নকারীর পরিচয় প্রথমে সাহাবায়ে কিরামের জানা ছিল না। তাই রাসূল ﷺ এর উত্তর সত্যায়ন করাকে তারা ধৃষ্টতা মনে করেছেন বিধায় তারা এরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

হাদীস বর্ণনার কারণ

হাদীসটি বর্ণনার কারণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ এ আয়াত নাযিল হলো তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা.) আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ভয়ে তারা আল্লাহর রাসূলের দরবারে কোনো প্রশ্ন করার সাহস পেতেন না। এমনকি একান্ত প্রয়োজন থাকলেও তারা প্রশ্ন করতে সাহসী হতেন না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কিরামকে আদব-শিষ্টাচার ও প্রশ্ন করার রীতিনীতি ইত্যাদি শিক্ষাদানের জন্য হযরত জিবরাঈল (আ.) কে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেন, যাতে সাহাবায়ে কিরাম নিঃসঙ্কোচে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে প্রশ্ন করে দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়বলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। হাদীসের শেষাংশেও এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন, হাদীসের ভাষ্য হলো: أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ -তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য এসেছিলেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা

এ হাদীসে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয়ের আলোচনা ও শিক্ষা রয়েছে। প্রথমে জিবরীল (আ.) যে পদ্ধতিতে দরবারে রিসালতে বসেছেন সেটিও একটি শিক্ষা। তিনি কিভাবে বসেছিলেন এ বিষয়ে হাদীসের ভাষ্য হলো- তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে বসলেন এবং তার দুই হাঁটুকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই হাঁটুর সাথে মিলালেন এবং নিজের দুই হাত তাঁর উরুর উপর রাখলেন। এখানে 'তাঁর উরু' বলতে দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, জিবরীল (আ.) নিজের দুই হাত নিজের উরুর উপর রেখেছিলেন। এটিই শিক্ষকের সামনে ছাত্রের বসার পদ্ধতি। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি নিজের দু হাত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উরুর উপর রেখেছিলেন। নাসাঈ শরীফের বর্ণনায়ও এরূপ রয়েছে। আল্লামা মোল্লা আলী কারী বলেন, এভাবে হাঁটুর সাথে সাথে হাঁটু মিলিয়ে কাছাকাছি বসা বিনয় ও আদবের অধিক নিকটবর্তী এবং পরিপূর্ণরূপে শ্রবণ ও মনোযোগ আকর্ষণে পরিপূর্ণতার লক্ষণ। এরূপ বসা থেকে প্রশ্নকারীর হাজত বা প্রয়োজনের আধিক্য বুঝায়। ফলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারীর হাজত ও আগ্রহের দিক বিবেচনায় দ্রুত জবাব প্রদান করতে এগিয়ে আসেন।

এ হাদীসে রাসূলে পাক ﷺ এর একান্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে জিবরীল (আ.) চারটি প্রশ্ন করেছেন। এগুলো হলো-

১. ইসলাম কী?
২. ঈমান বলতে কী বুঝায়?
৩. ইহসান কী?
৪. কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?

ইসলাম এর পরিচয়

ইসলাম শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেওয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নাম ইসলাম। হাদীসে প্রশ্নকারী হযরত জিবরাঈল (আ.) ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইলে এর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের মৌলিক পাঁচটি বিষয়ের কথা বলেছেন। এগুলো হলো- ১. ঈমানের ঘোষণা দেওয়া অর্থাৎ তুমি একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, ২. নামায কায়েম করবে, ৩. যাকাত দিবে, ৪. রামাদানের রোযা রাখবে ৫. সামর্থবান হলে বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে। এ পাঁচটি বিষয় মুসলিম জীবনের প্রধান অনুষঙ্গ ও বাহ্যিক রূপ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর আনুগত্যের ভিত্তিতেই এগুলো সম্পাদিত হয়।

ঈমান এর পরিচয়

ঈমান শব্দের অর্থ হলো বিশ্বাস করা বা সত্যায়ন করা, আনুগত্য করা ইত্যাদি। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে ঈমান হলো আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির নাম। ইমাম গাযালী (র.) এর মতে, নবী করীম ﷺ যা নিয়ে এসেছেন সেসকল বিষয়সহ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান। আলোচ্য হাদীসে ঈমান কী এ প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু মৌলিক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলেছেন। এগুলো হলো- ১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, ২. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস করা, ৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস করা, ৪. রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস করা ৫. আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ৬. তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা। এ বিশ্বাসসমূহ হলো অন্তরের বিষয়। মনে-প্রাণে এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

ঈমানে মুফাসসাল এর মধ্যে মৌলিক সাতটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা আমরা পাই। পূর্বোক্ত ছয়টি বিষয় ছাড়া আরেকটি হলো 'মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন' করা। কিন্তু আলোচ্য হাদীসে এ কথা নেই। তবে আলাদাভাবে না থাকলেও মূলত আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে এ বিশ্বাসের কথাও লুক্কায়িত রয়েছে। বুখারী শরীফের অন্য বর্ণনায় 'ঈমান কী?' এ প্রশ্নের জবাবে 'মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন' এর বিষয় আছে। হাদীসের কিতাবাদিতে কোনো কোনো বর্ণনায় কেবল আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা আছে, আবার কোনো বর্ণনায় কেবল 'মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন' এর কথা আছে। ঈমানে মুফাসসালে উভয় বর্ণনার সমন্বয় করা হয়েছে। তাছাড়া কোনো কোনো বর্ণনায় জান্নাত, জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথাও আছে।

এগুলো মূলত মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অংশ হিসাবে তা আলাদাভাবে ঈমানে মুফাসসালে সন্নিবেশিত হয়নি।

ঈমান ও ইসলাম এর পার্থক্য

ঈমান ও ইসলাম এক না ভিন্ন বিষয় এ নিয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। এ হাদীসের বর্ণনাভঙ্গি থেকে উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ঈমান হলো অন্তরের বিষয় আর ইসলাম হলো এর বাহ্যিক দিক। একদল উলামায়ে কিরামের মতে, ঈমান ও ইসলাম এক বিষয়। এতদুভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইবনু হাজার আসকালানী (র.) মতে, ঈমান ও ইসলাম এ দু শব্দ ব্যবহারিক দিক থেকে ফকীর ও মিসকীন শব্দদ্বয়ের মতো। দুটি শব্দ একত্রে আসলে ভিন্ন অর্থ প্রদান করবে আর পৃথকভাবে আসলে একই অর্থ প্রদান করবে।

ইহসান এর পরিচয়

ইহসান শব্দের অর্থ হলো সুন্দর করা, নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। পরিভাষায় ইহসান হলো জাহির ও বাতিন উভয়কে সংশোধন করা এবং খুশু-খুযু সহ যাবতীয় শর্ত সহকারে আদবের সাথে আমল করা। আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, এখানে ইহসান বলতে ইখলাস উদ্দেশ্য। এটি ঈমান ও ইসলাম উভয়টি বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। কেউ যদি ঈমানের কালিমা বা বাক্য মুখে উচ্চারণ করে এবং প্রয়োজনীয় আমলও করে কিন্তু তাতে যদি ইখলাস বা একনিষ্ঠতা না থাকে তা হলে সে 'মুহসিন' বলে গণ্য হবে না এবং তার ঈমানও শুদ্ধ হবে না। (শরহু মিশকাত লিত তীবী)

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ঈমান তথা আন্তরিক বিশ্বাস ও ইসলাম তথা বাহ্যিক আমল শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইহসান শর্ত। এই ইহসানের মূল মর্ম হলো নিজের ঈমান, আমল সবকিছুকে আল্লাহর জন্য খালিস করা, সব সময় নিজেকে আল্লাহর দৃষ্টির মধ্যে ও তাঁর সমীপে হাজির মনে করা। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ইহসান কী?' এই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাকে দেখছ। আর যদি তাকে দেখছ এটি মনে করতে না পার তাহলে মনে করবে তিনি তোমাকে দেখছেন। এটিই ইলমে তাসাওউফের মূলকথা। তাই উলামায়ে কিরাম ইহসান বলতে ইলমে তাসাওউফ বুঝিয়ে থাকেন। সূফিয়ায়ে কিরাম বলেন, কেউ যদি হৃদয়ে এই ধ্যান স্থায়ী করে নিতে পারে যে আল্লাহ তাকে দেখছেন তাহলে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কোনো অবস্থাতেই তার পক্ষে কোনো গুনাহ'র কাজে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হবে না। কুরআন ও সুন্নাহতে এর অগণিত দলীলও রয়েছে।

এখানে ইহসানের দুটি স্তরের বর্ণনা রয়েছে। একটি হলো নিজে আল্লাহকে দেখার অনুভূতি বা স্তর। উচ্চ পর্যায়ের আরিফগণের অবস্থা এটি। আরেকটি হলো আল্লাহ আমাকে দেখছেন এই অনুভূতি বা স্তর। একজন সাধারণ মুসলমান সদা-সর্বদা এ বিশ্বাস ও ধ্যান হৃদয়ে পোষণ করে নিজের সকল আমলকে সংশোধন ও আল্লাহর ওয়াস্তে খালিস করে নিতে পারে।

কিয়ামতের আলামত

এ হাদীসে হযরত জিবরীল (আ.) এর শেষ প্রশ্ন ছিলো, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? এর জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক জানেন না। রাসূল ﷺ এ কথা বলেননি যে, আমি জানি না। বরং বলেছেন, প্রশ্নকারীও এ বিষয়ে অধিক জানেন না। এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন যে কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে তা কেউই জানেন না। এটি কেবল আল্লাহই ভালো জানেন। যেমন পবিত্র কুরআন মাজীদে এসেছে- اِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ -কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর হাতে।

এরপর জিবরীল (আ.) কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে দুটি আলামতের কথা উল্লেখ করেন।

এক. দাসী তার মনিবকে জন্ম দিবে। এর ব্যাখ্যা নিয়ে মুহাদ্দিসীনে কিরামের বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। আল্লামা আইনী (র.) বলেন, যুদ্ধে ব্যাপক সংখ্যক নারী দাসী হয়ে আসবে। এরপর মালিকের সাথে সহবাসে সন্তান জন্ম দিবে। মালিকের মৃত্যুর পর সন্তান তার তার মায়ের মালিকের মতো হবে।

কেউ কেউ এর দ্বারা আমানতের খেয়ানত ও অপাত্রে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন অন্য হাদীসে আছে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে এসে প্রশ্ন করলেন, কিয়ামত কখন হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাৎক্ষণিক প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পূর্বের আলোচনা অব্যাহত রাখলেন। পরে প্রশ্নকারীকে খুঁজে বললেন, فَاِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ -যখন আমানত নষ্ট হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। তখন প্রশ্নকারী আবার বললেন, আমানত নষ্ট হওয়া মানে কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ -যখন যোগ্য নয় এমন ব্যক্তির নিকট ক্ষমতা প্রদান করা হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। (বুখারী)

দুই. নগ্নপদ, উলঙ্গ শরীর, দরিদ্র, মেষ রাখালদের উঁচু দালান নিয়ে গর্ব করতে দেখবে। অর্থাৎ যারা একেবারে নিঃস্ব তারা অঢেল সম্পদের অধিকারী হবে এবং উঁচু বাড়ি-ঘর ও দালান নির্মাণে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। অথচ তাদের না ছিলো জুতা পরার সামর্থ্য, না ছিলো কাপড় কেনার সামর্থ্য। বরং মেষ রাখালী করে তারা জীবন কাটাতো।

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র দুটি আলামতের কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের সমাজে এ দুটি আলামত চাক্ষুষ দৃশ্যমান। কিয়ামতের আরো অনেক আলামত বা নিদর্শন রয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে এসবের বর্ণনা রয়েছে।

হাদীসের শিক্ষা

এ হাদীস থেকে আমরা অনেক শিক্ষা পাই। এর মধ্যে রয়েছে-

১. নবী করীম ﷺ এর আদর্শ হলো সাহাবায়ে কিরামের সাথে উঠাবসা করা। এটি তাঁর উত্তম চরিত্রের একটি দিক। সুতরাং আমাদের জন্য উচিত হলো সমাজের মানুষের সাথে মিলে মিশে থাকা। কেননা মানুষের সংশ্রব দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর না হলে একাকী থাকার চেয়ে সকলের সাথে মিলেমিশে থাকা উত্তম। তবে মানুষের সংশ্রব দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর হলে একাকী থাকাই উত্তম।

২. কোনো বিষয় জানা না থাকলে জানার উদ্দেশ্যে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করা উচিত। পবিত্র কুরআনেও এর নির্দেশ রয়েছে।

৩. আলিম-উলামা, মর্যাদাবান মানুষ ও রাজা-বাদশাহ'র দরবারে সুন্দর পোশাকে পরিপাটি ও পরিচ্ছন্নরূপে যাওয়া উচিত। এ থেকে এ দলীলও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, ইবাদত-বন্দেগীর উদ্দেশ্যে আল্লাহর সমীপে হাজির হওয়ার সময় সুন্দর পোশাক পরিধান করা উত্তম।

৪. উলামায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের সামনে আদবের সাথে বসা উচিত।

৫. সর্বোপরি নিজের ঈমান, আমল সবকিছুকে আল্লাহর জন্য খালিস করা এবং সব সময় নিজেকে আল্লাহর সমীপে হাজির মনে করার ধ্যান হৃদয়ে জাগ্রত করা একান্ত জরুরী।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)

মাওলানা মো. নজমুদ্দীন চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

হযরত আলী (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী চারজনের মধ্যে হযরত আলী (রা.) একজন। আর প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদিজা (রা.), স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা.), বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা.) ও মাওয়ালীর মধ্যে হযরত যায়িদ বিন হারিসা (রা.)।

কত বছর বয়সে হযরত আলী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছেন এ প্রসঙ্গে ইবনে কাসির বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার বয়স ছিল সাত বছর। কেউ বলেন আট বছর, কেউ বলেছেন দশ বছর, আবার কেউ বলেছেন ষোলো বছর। মুহাম্মদ বিন কাব আল কুরাযী বর্ণনা করেন, মহিলাদের মাঝে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন খাদিজা (রা.) এবং পুরুষদের মধ্যে আবূ বকর ও আলী (রা.)। কিন্তু আবূ বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ করেছেন আর আলী (রা.) ইসলাম গ্রহণ গোপন রেখেছেন পিতার ভয়ে। অতঃপর আবূ তালিব আলীকে রাসূল ﷺ এর অনুসরণ ও সাহায্যের আদেশ দিয়েছেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

মাজমাউয যাওয়াইদ এর মধ্যে আছে,

عن ابن عباس رضي الله عنه قال دفع النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم بدر إلى علي وهو ابن عشرين سنة –

-ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.) কে ঝাণ্ডা দিলেন তখন হযরত আলী (রা.)-এর বয়স ছিল বিশ বছর। (মাজমাউয যাওয়াইদ)

রাসূল ﷺ এর নুবুওয়াতের ১৩তম বছরের রবিউল আউয়াল মাসে হিজরত করেন। অর্থ্যাৎ তিনি নুবুওয়াতের পূর্ণ বার বছর মক্কায় অবস্থান করেছেন এবং ১৩তম বছরে হিজরত করেছেন। এদিকে হিজরতের দ্বিতীয় বছরের রামাদান মাসে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয় অর্থাৎ হিজরতের পূর্ণ একবছর পর দ্বিতীয় বছরের রামাদান মাসে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এখানে আরো পূর্ণ একবছর পাওয়া গেল। নবুওয়াতের পূর্ণ বার বছর মক্কায় অবস্থান ও হিজরতের পূর্ণ এক বছর পর বদর যুদ্ধ হওয়ায় নবুওয়াতের পূর্ণ তেরো বছর পর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। যেহেতু হযরত আলী (রা.) নবুওয়াতের একেবারে প্রারম্ভিক কালে প্রথম বছরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর তখন তার বয়স ছিল সাত বছর, সেহেতু বদর যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল পূর্ণ বিশ বছর।

বাল্য বয়সে দৃঢ় প্রত্যয়

নবুওয়াতের তৃতীয় বছরে রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.) কে আদেশ দিলেন দাওয়াতের ইন্তেজাম করার জন্য। আবদুল মুত্তালিবের সমস্ত খান্দান দাওয়াতে আসলেন। খাওয়া দাওয়ার পর রাসূল ﷺ সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি এমন একটি বিষয় নিয়ে এসেছি যাতে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ নিহিত। আপনাদের মাঝে কে আমার সহযোগী হবেন? পুরো মজলিস নিরুত্তর। এমন সময় হযরত আলী (রা.) বলে উঠলেন, যদিও আমি সকলের মাঝে বয়সে ছোট, আমার পদদ্বয় দুর্বল, চোখ অসুস্থ তথাপি আমি আপনার সাথে থাকব।

হযরত আলী (রা.) আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত

হাদীস শরীফে আছে,

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ دعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عليًّا وفاطمةَ وحسَنًا وحُسينًا، فقالَ: اللَّهمَّ هؤلاءِ أهلُ بيتي (رواه مسلم)

-হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ এ আয়াতটি নাযিল হয় তখন রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.), ফাতিমা (রা.), হাসান (রা.) ও হোসাইন (রা.)কে ডেকে আনলেন এবং বললেন হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বায়ত। (সহীহ মুসলিম, ফাদ্বাইলুস সাহাবা, বাব: মিন ফাদ্বাইলি আলী ইবনে আবি তালিব)

অন্য হাদীসে আছে,

عن عائشة رضي الله عنها قالت خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غداة وعليه مِرْط مرَحَّل من شعر أسود فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (رواه مسلم)

-হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একদিন সকাল বেলা বের হলেন। আল্লাহর নবীর বদন মুবারকে কালো পশমী চাঁদর ছিল, যে চাঁদরে উটের গদির ছবি ছিল। তখন হাসান আসলেন রাসূল ﷺ তাকে চাঁদরে ডেকে নিলেন। তারপর হোসাইন আসলেন তিনিও চাঁদরের ভিতর ঢুকে গেলেন। অতঃপর ফাতিমা (রা.) আসলেন, তাকেও আল্লাহর নবী চাঁদরে বেষ্টন করলেন। তারপর আলী (রা.) এলেন, রাসূল ﷺ তাকেও চাঁদরে বেষ্টন করলেন। অতঃপর বললেন-

إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا–

-হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। (সহীহ মুসলিম, ফাদ্বাইলুস সাহাবা, বাবু ফাদ্বাইলি আহলি বাইতিন নাবী ﷺ)

অপর বর্ণনায় আছে,

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما .

-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, হাসান ও হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বেহেশতি জোয়ানদের সরদার এবং তাদের পিতা তাঁদের চেয়ে উত্তম। (ইবনে মাজাহ, আবওয়াবু ফাদ্বাইলি আসহাবি রাসূলিল্লাহ, বাব: ফাদ্বলু আলী ইবনে আবি তালিব)

হযরত আলী (রা.) জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী

হযরত আলী (রা.) জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত বিশেষ দশজন সাহাবী (আশারায়ে মুবাশশারাহ) এর একজন। হাদীস শরীফে আছে,

عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة

-হযরত আবদুর রাহমান ইবনু আউফ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন- আবূ বকর, উসমান, আলী, জুবায়ের, তালহা, আব্দুর রহমান বিন আউফ, সা'দ (ইবনে আবি ওয়াক্কাস), সাঈদ (ইবনে যায়দ) এবং আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম জান্নাতী। (তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাব: মানাকিবু আব্দির রাহমান ইবনে আউফ)

হযরত আলী (রা.)-এর ফয়সালা

হাদীস শরীফে আছে-

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدُّهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب (الخ)

-হযরত আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে উম্মতের প্রতি সর্বাধিক দয়াশীল আবূ বকর, দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর উমর, সর্বাধিক লজ্জাশীল উসমান ও সর্বোত্তম ফয়সালাকারী আলী ইবনে আবি তালিব। (ইবনে মাজাহ, আবওয়াবু ফাদ্বাইলি আসহাবি রাসূলিল্লাহ, বাব: ফাদ্বাইলু খাব্বাব রা.)

ইমাম বাগাভী (র.) বর্ণনা করেন,

عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اقضي امتي علي–

-হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে আলী সর্বোত্তম কাযী (ফায়সালাকারী)। (শরহুস সুন্নাহ; ফতহুল বারী)

অন্য বর্ণনায় আছে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عُمَرُ عَلِيٌّ أَقْضَانَا وَأُبَيٌّ أَقْرَؤُنَا

-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) বলেছেন, আমাদের মধ্যে আলী সর্বোত্তম ফায়সালাকারী এবং উবাই ইবনু কা'ব সর্বোত্তম কারী। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, সূরা বাকারা, বাবু কাওলিহি মা নানসাখু মিন আয়াতিহি)

অপর বর্ণনায় আছে,

عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن وأنا حديث السن قال قلت تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء قال ان الله سيهدى لسانك ويثبت قلبك

-হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে কাযী হিসেবে ইয়ামনে পাঠালেন। তখন আমার বয়স কম। আলী (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে এমন কওমের কাছে পাঠাচ্ছেন যাদের মাঝে নতুন বিষয়াদী দেখা দিবে, যা ফয়সালা করার মতো জ্ঞান আমার নেই। রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ পাক তোমার রসনাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করবেন এবং তোমার কলবকে (হকের উপর) স্থির রাখবেন। (আবূ দাউদ, কিতাবুল আকদ্বিয়াহ, বাব: কাইফাল কাদ্বা)

হযরত আলী (রা.) ও একটি জটিল বিচার

রাসূল ﷺ আলীকে ইয়ামনে পাঠালেন। তিনি সেখানে গেলে একটি বিচার তার কাছে আসল। বিষয়টি হলো এই: চারজন লোক কূপে পতিত হয়ে এক সিংহের আক্রমণে নিহত হয়। এটি ছিল এমন একটি কূপ, যা সিংহ শিকারের জন্য খোদাই করা হয়েছে। প্রথম যে লোকটি পতিত হয় সে পতিত হওয়াকালে আরো একজনকে ঝাপটে ধরে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি আরো একজনকে ঝাপটে ধরে এভাবে তৃতীয় ব্যক্তি আরো একজনকে ঝাপটে ধরে এবং চারজনই সিংহের কূপে পড়ে যায়। গর্তের মধ্যে সিংহের আক্রমণে সকলেই নিহত হয়। নিহত চারজনের ওয়ারিশগণ কূপ খননকারীদের সাথে এ নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। এমনকি রক্তারক্তি কাণ্ড হওয়ার উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় হযরত আলী (রা.) বললেন, আমি তোমাদের মাঝে বিচার করে দেব। যদি তোমরা রাজি হও তবে এটিই হবে ফয়সালা। আর যদি অসম্মত হও তবে রাসূল ﷺ এর দরবারে যাবে, তিনিই তোমাদের ফয়সালা করে দিবেন। তোমরা কূপখননকারী গোত্রকে ডাক। এ বিষয়ে ফয়সালা হলো, পূর্ণ এক দিয়াতের চর্তুথাংশ, তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ এবং পূর্ণ একটি দিয়াত (রক্তপণ)। প্রথম যে ব্যক্তি পতিত হয়েছে তার জন্য এক দিয়াতের চর্তুথাংশ দিতে হবে। কেননা সে তার উপরের ব্যক্তিত্রয়কে হালাক করেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য এক দিয়াতের তৃতীয়াংশ কারণ সে তার উপরের ব্যক্তিদ্বয়কে হালাক করেছে, তৃতীয় ব্যক্তির জন্য এক দিরহামের অর্ধাংশ, কারণ সে তার উপরের ব্যক্তিটিকে ধ্বংস করেছে। আর চতুর্থ ব্যক্তির জন্য পূর্ণ একটি দিয়াত দিতে হবে। নিহত ব্যক্তিদের ওয়ারিশগণকে কূপ খননকারী উল্লেখিত হারে রক্তপণ দিবে। লোকেরা এ ফয়সালা মানতে রাজী হলো না। ফয়সালার জন্য তারা রাসূল ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। আল্লাহর নবী ﷺ বললেন, আমি ফায়সালা করে দেব। এমন সময় আগত দলের একব্যক্তি বলে উঠল যে, হযরত আলী এর ফয়সালা করেছেন এবং বিষয়টি সে খুলে বলল। আল্লাহর নবী তখন হযরত আলীর ফয়সালাটি অনুমোদন করলেন। (ইযালাতুল খিফা)

হযরত আলী ও হামদান গোত্র

বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের পর আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন গোত্র ইসলাম কবুল করল। যারা এখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি রাসূল ﷺ তাদের প্রতি ইসলামের দাওয়াতকারী প্রেরণ করলেন। হযরত আলী (রা.) কে ইয়ামনে হামদান গোত্রের কাছে পাঠালেন। হযরত বারা বিন আযিব হযরত আলীর সাথে ছিলেন। তিনি বললেন, আমরা ইয়ামনে পৌঁছলে হামদান গোত্রের লোকেরা জামায়েত হল। হযরত আলী আমাদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। আমাদের নামায শেষ হলে লোকেরা কাতারবন্দি হয়ে আমাদের সম্মুখে হাজির হলো। হযরত আলী (রা.) হামদ ও সানার পর রাসূল ﷺ এর পত্র তাদের সম্মুখে পাঠ করলেন। অতঃপর হামদান গোত্রের সকল মানুষ একদিনের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করল। হযরত আলী (রা.) পত্রযোগে রাসূল ﷺ কে বিষয়টি অবগত করলেন। পত্র পাঠের পর রাসূল ﷺ সিজদায় পতিত হলেন এবং বললেন আসসালামু আ'লা হামদান, আসসলামু আ'লা হামদান অর্থাৎ হামদান গোত্রের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হামদান গোত্রের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (যাদুল মাআদ)

বিচার-ফয়সালার আরেকটি নজীর

বর্ণিত আছে, একদা দুইজন লোক একত্রে খেতে বসল। তাদের একজনের কাছে তিনখানা রুটি, অন্যজনের পাঁচখানা রুটি। এমন সময় তারা এক ব্যক্তিকে তাদের কাছ দিয়ে যেতে দেখে তাদের সাথে খাবার জন্য আহবান করল। লোকটি আহবানে সাড়া দিয়ে তাদের সাথে খেতে বসল। তারা তিনজন সমপরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করল। খাবার পরে আগন্তুক ব্যক্তি আটটি দিরহাম উভয়ের সামনে রেখে বলল, আমি যে তোমাদের সাথে খেয়েছি এর বদলে এই আটটি দিরহাম তেমরা গ্রহণ কর। তারপর সে চলে গেল। এখন এ দিরহামের বণ্টন নিয়ে উভয়ের মাঝে বিতর্ক দেখা দিল। পাঁচ রুটির মালিক বলল যেহেতু আমার রুটি পাঁচখানা তাই পাঁচ দিরহাম আমার প্রাপ্য। আর তোমার রুটি তিনটি তাই তুমি তিন দিরহাম গ্রহণ কর। এতে তিন রুটি ওয়ালা রাজি হলো না।

বিষয়টি ফায়সালার জন্য তারা হযরত আলী (রা.) এর খেদমতে হাজির হলো। হযরত আলী (রা.) তিন রুটির মালিককে বললেন, তুমি তিন দিরহামই নিয়ে নাও। কারণ দলীল ভিত্তিক ফায়সালা করলে তুমি পাবে মাত্র এক দিরহাম। লোকটি বলল, আমিরুল মুমিনীন বিষয়টি আমাকে বুঝিয়ে দিলে দলীল ভিত্তিক ফায়সালায় আমি রাজী হয়ে যাব। তখন হযরত আলী (রা.) তাকে বললেন, তোমার সাথীর পাঁচখানা ও তোমার তিনখানা মোট আটখানা রুটি ছিল। প্রত্যেক রুটি যদি তিনভাগে ভাগ করা হয় তবে চব্বিশ অংশ হবে। তোমরা প্রত্যেকে সমানভাগে খাদ্য গ্রহণ করেছ তাই প্রত্যেকে আট অংশ খেয়েছে। তোমার তিনখানা রুটিতে ছিল নয় অংশ তুমি নিজে আট অংশ খেয়ে ফেলেছ। বাকি রয়েছে মাত্র একটি অংশ। সুতরাং তুমি পাবে এক দিরহাম। তোমার সাথীর রুটি ছিল পাচঁখানা। পাঁচখানা রুটিতে পনের অংশ। সে নিজে খেয়েছে আট অংশ, বাকি রয়েছে সাত অংশ তাই তার প্রাপ্য সাত দিরহাম। (ইযালাতুল খিফা)

(চলবে)

কুরআনে নবী-শ্রেষ্ঠত্বের অনুষঙ্গঃ পরিপ্রেক্ষিত সূরা বাকারা

মূলঃ আব্দুল্লাহ বিন সিদ্দিক আল গুমারী (র.)

অনুবাদঃ সাঈদ হুসাইন চৌধুরী

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ– هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ– الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ– وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ–

-এটা সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ, যারা গায়বের বিষয়ে ঈমান আনে এবং নামায কায়িম করে, আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে, আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে সেসব বিষয়ের উপর, যা কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা বাকারা, আয়াত-২-৪)

আল্লাহ তাআলা তাকওয়া অর্জনের জন্য রাসূলের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমানকে শর্তায়িত করেছেন। এটাকে তিনি হিদায়াত ও সফলতার ভিত্তি বানিয়ে দিয়েছেন। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর নাযিলকৃত কুরআন কারীমের উপর ঈমান আনয়নের কথা অন্যান্য নবীর কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনয়নের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। এটা বুঝানোর জন্য যে, অন্যান্য কিতাবের উপর ঈমান আনার মূল ভিত্তি হলো কুরআনের উপর ঈমান আনা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ

-আর যখন তাদেরকে বলা হয়, লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মতো! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবীদের ঈমানের ব্যাপারে যখন কাফিরদের বলা হতো, তারা সাহাবীদেরকে বোকা বা নির্বোধ বলে গালি দিত। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর সাহাবীদের বিরুদ্ধবাদীদের একাধিক تأكيد (দৃঢ়তা) এর শব্দ ব্যবহার করে তাদের জবাব দিয়েছেন। অন্যান্য নবীর সঙ্গীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এমন করেননি। নূহ (আ.) এর সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করুন। তাঁর জাতির লোকেরা বলেছিল,

أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ

-আমরা কি তোমাকে মেনে নেব যেখানে তোমার অনুসরণ করছে ইতরজনেরা! (সূরা শুআরা, আয়াত-১১১)

নূহ (আ.) এর জাতি তার প্রতি ঈমান আনয়নকারী তার সঙ্গীদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে। কিন্তু তাদের অপমানসূচক বক্তব্যের জবাব নূহ (আ.) কেই দিতে হয়েছিল। কুরআনে এসেছে,

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا– قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ

-তিনি (নূহ) বললেন, তারা কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি দরকার? তাদের হিসাব নেয়া আমার পালনকর্তারই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে! (সূরা শুআরা, আয়াত-১১২-১১৩)

এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ তাআলা শুধু তাঁর নবীর সম্মানের কারণেই নবীর সাহাবীদের বিযোদগারের জবাব দিয়েছেন।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ -আমি আপনার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। ফাসিক ব্যতীত কেউ এগুলো অস্বীকার করে না। (সূরা বাকারা, আয়াত-৯৯)

এই আয়াত আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদী পণ্ডিত আব্দুল্লাহ ইবনু সূরিয়্যার একটি কটুক্তির জবাবে নাযিল করেছেন। সে নবীর ওহীকে অস্বীকার করে বলেছিল, ما جئت بشئ

বিষয়টি এ কারণেই উল্লেখ করছি যে, দেখা যাচ্ছে আল্লাহ তাআলা তার নবীর উপর আরোপিত প্রতিটি অপবাদের জবাব তিনি নিজেই প্রদান করছেন। এমনকি মুশরিক, ইয়াহুদী কিংবা খ্রিষ্টান, যে যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর অপবাদ দিয়েছে বা কুৎসা রটনা করেছে, আল্লাহ তাআলা নিজে তাদের অপবাদ বা কুৎসার জবাব দিয়েছেন। এসব জবাব কখনও কখনও ছিল দৃঢ়তাজ্ঞাপক অব্যয় যোগে, কখনো শপথ করে, আবার কখনো ছিল যথার্থ ভাষালঙ্কার প্রয়োগের মাধ্যমে।

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা একাধিক তাকীদ (تأكيد) ব্যবহার করেছেন। প্রথমত لام القسم তথা শপথের অর্থজ্ঞাপক لام ব্যবহার করেছেন। সুতরাং আয়াতের উহ্য অংশ হবে, والله لقد أنزلنا ...(আল্লাহর কসম! আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি...)। দ্বিতীয়ত قد তথা تحقيق অর্থজ্ঞাপক অব্যয় ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া তিনি آيات শব্দকে بينات বিশেষণ দ্বারা বিশেষায়িত করেছেন। এটা বুঝানোর জন্য যে, এই কিতাবের স্পষ্টতাই একে অবজ্ঞা করার সমূহ সম্ভাবনা নাকচ করে দিচ্ছে। আর আয়াতের শেষাংশ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ এখানে আল্লাহ তাআলা কুরআন অস্বীকারের বিষয়টি ইয়াহুদীদের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে ফাসিক বলে অভিহিত করেছেন।

এই বিশেষত্ব আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ﷺ কে দান করেছেন এবং এর মাধ্যমে তাঁর নবীকে অন্যান্য সকল নবী-রাসূলের উপর মর্যাদাবান করেছেন। কেননা অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রে তাদের উপর আরোপিত অপবাদের জবাব প্রদান করা তাদের নিজেদের দায়িত্ব ছিল। যেমন হযরত নূহ (আ.) নিজের পক্ষাবলম্বন করে বিরুদ্ধবাদীদের জবাবে বলেছেন, يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ "হে আমার সম্প্রদায়! আমি কখনও ভ্রান্ত নই; বরং আমি বিশ্বপ্রতিপালকের রাসূল।" (সূরা আরাফ, আয়াত-৬১)

হযরত হুদ (আ.) বলেছেন, يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ- হে আমার সম্প্রদায়, আমি মোটেই নির্বোধ নই, বরং আমি বিশ্বপ্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল। (সূরা আরাফ, আয়াত-৬৭)

ফিরাউন যখন হযরত মূসা (আ.) কে জাদুর অপবাদ দিয়েছিল তখন তিনি নিজে জবাব দিয়ে বলেছেন, لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا -তুমি জান যে, আসমান ও যমীনের পালনকর্তাই এসব নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন। হে ফিরাউন, আমার ধারণা তুমি ধ্বংস হতে চলেছ। (সূরা ইসরা, আয়াত-১০২)

এভাবে অন্যান্য নবীগণের প্রত্যেকেই নিজের জবাব নিজে দিয়েছেন। তাই এই মূলনীতি আয়ত্ত্ব করে রাখ, যা নবী করীম ﷺ এর উচ্চ

মর্যাদা বর্ণনা করে। আমি 'আল ইস্তিগাছাহ' গ্রন্থে এই মূলনীতির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছি,

نبي تولى الله عنه دفاعه + و خيب قوما قد رموه بجنة

-এই নবী এমন, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা যার প্রতিরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। আর যারা তাঁকে পাগলের অপবাদ দিয়েছে, তিনি তাদেরকে নিরাশ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

-হে মুমিনগণ, তোমরা 'রায়িনা' বলো না, 'উনযুরনা' বলো এবং তিনি যা বলেন তা শুনতে থাকো। আর কাফিরদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (সূরা বাকারা, আয়াত-১০৪)

পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর মতো এখানেও আল্লাহ তাআলা নিজে তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রতিহত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কতিপয় সাহাবী তাদের নিজেদের প্রচলিত ভাষায় তাঁকে 'راعنا' (আমাদের কথা শুনুন) বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। ইয়াহুদীরাও তাকে 'راعنا' বলে সম্বোধন করত। কিন্তু ইয়াহুদীরা 'راعنا' শব্দটিকে রাসূলুল্লাহর নিন্দার্থে 'رعونة' বা নির্বুদ্ধিতা বলে উল্লেখ করত। আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে এই শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন এবং এর পরিবর্তে 'انظرنا' বলে সম্বোধন করতে আদেশ দিয়েছেন। যাতে কোনো তাচ্ছিল্য বা ভিন্নার্থ নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই শব্দ পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হলো রাসূল ﷺ এর সম্মান ও মর্যাদাকে রক্ষা করা এবং এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ কে নিয়ে পরোক্ষ তাচ্ছিল্যের পথটিও রুদ্ধ করে দেওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

-যারা অজ্ঞ, তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন না? অথবা আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন কেন আসে না? এমনিভাবে তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও এদেরই অনুরূপ কথা বলেছে। তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয় আমি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি তাদের জন্য যারা প্রত্যয়শীল। (সূরা বাকারা, আয়াত-১১৮)

মক্কার মুশরিকরা রাসূল ﷺ এর রিসালাতের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে বলত, যদি আপনার রিসালাতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলতেন, অথবা আপনার রিসালাতের সত্যায়নে আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো নিদর্শন আসত, তাহলে হয়তো আমরা বিশ্বাস করতাম। তাদের এমন ফাঁকিপূর্ণ ও অবাস্তব কথা শুনে রাসূল ﷺ খুব কষ্ট পেতেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে সান্তনা দিয়ে বলেছেন, كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ঠিক এমন কথা পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যকার কাফিররাও বলেছিল। মূলত (কুফরী ও অবাধ্যতার ক্ষেত্রে) তাদের অন্তরের সাদৃশ্য রয়েছে।

পরক্ষণেই, এই আয়াতের পরের আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূলের রিসালাতকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে বলেছেন, إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ -নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। আপনি দোযখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না। (সূরা বাকারা, আয়াত-১১৯)

অর্থাৎ, কেন তারা ঈমান আনেনি (এমন জবাবদিহি আপনাকে করা হবে না)। আপনার দায়িত্ব কেবল দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। আপনার উপর যে দায়িত্ব ছিল তা আপনি পৌঁছে দিয়েছেন। এখন তাদের হিসাব-নিকাশ আমার দায়িত্বে। وَلَا تُسْأَلُ ক্রিয়াপদ কোনো কোনো কিরাতে জযম দেওয়া হয়েছে। জানার অর্থে নিষেধ সূচক 'লা', তখন আয়াতের অর্থ হবে, দুযখীদের শাস্তি কেমন হবে এই বিষয়ে আপনি জানতে চাইবেন না। কারণ আমার কাছে তাদের শাস্তি অনেক কঠিন, যার বর্ণনা দেওয়া যায় না। অথবা তাদের জন্য শাফাআত করার উদ্দেশ্যেও তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না। কেননা কুফরীর কারণে তারা চরম ও অবর্ণনীয় শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত।

তাফসীরে তাবারীতে এসেছে, রাসূল (সা.) তাঁর পিতামাতার ব্যাপারে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "যদি আমি আমার পিতা-মাতার ব্যাপারে জানতে পারতাম"। এরপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াত وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ নাযিল করে রাসূলকে তাদের ব্যাপারে কোনো দুআ করতে নিষেধ করেছেন, কেননা তারা জাহান্নামী। কিন্তু এই বর্ণনাটি মুরসাল, দায়িফ। আয়াতের অপরাপর প্রসঙ্গও এই বর্ণনার দুর্বলতা নির্দেশ করছে। প্রকৃতপক্ষে, রাসূলুল্লাহর পিতা-মাতা ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। তারা উভয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্ত। এ ব্যাপারে আমি 'খাওয়াতিরুন দ্বীনিয়্যাহ' গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছি।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

-এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা মানবমণ্ডলির জন্য সাক্ষ্যদাতা হও আর রাসূল হোন তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৪৩)

আয়াতে وَسَطًا বলতে উত্তমতা এবং ন্যায়পরায়ণতা বুঝানো হয়েছে, شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ বলতে অন্যান্য উম্মতের কাছে তাদের নবীগণ আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন; এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদানকে বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহর সম্মানার্থেই তাঁর উম্মতকে আল্লাহ তাআলা এই মর্যাদা দিয়েছেন।

কা'ব আল আহবার বলেন, আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে এমন তিনটি বিশেষত্ব দিয়েছেন যা ইতিপূর্বে কোনো নবী-রাসূল ব্যতিত অন্য কাউকে দেননি। প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ বলেছিলেন, أنت شاهد على خلقي (আপনি আমার সৃষ্টির জন্য সাক্ষী) আর এই উম্মতকেও আল্লাহ বলেছেন, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (যাতে করে তোমরা মানবমণ্ডলির জন্য সাক্ষ্যদাতা হতে পারো)। কোনো কোনো নবীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন, ما عليك من حرج (আপনার জন্য কোনো জটিলতা থাকবে না), আমাদের জন্যও আল্লাহ তাআলা একই কথা বলেছেন, مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ (আল্লাহ তোমাদের জন্য কোনো জটিলতা চান না)। নবীদেরকে তিনি বলেছেন, ادعني أستجب لك (আপনি ডাকুন, আমি আপনার ডাকে সাড়া দেবো)। আমাদের উদ্দেশ্যেও তিনি বলেছেন, ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব)।

(ইষৎ সংক্ষেপিত)

সাইমুন

লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী

এখানে স্কুল-কলেজ-মাদরাসার যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক কোরআন শরীফ, ধর্মীয় বই, স্কুলব্যাগ, স্টেশনারী সহ অন্যান্য গিফ্‌ট সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়।

পরিচালক: মাওলানা আতাউর রহমান

মোবাইল: ০১৭১৯ ৪২৮০৬৯

শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ

(হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা সংলগ্ন)

সোবহানীঘাট, সিলেট

মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে ফকীহগণের মর্যাদা

মো. মুহিবুর রহমান

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের সুন্দর জীবনবিধান দিয়েছেন। সালাত ও সালাম সায়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি, যিনি মানুষের জীবনবিধানের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআন-সুন্নাহ সংরক্ষণের পাশাপাশি দীনের বিভিন্ন দিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। কুরআন-সুন্নাহ থেকে মানুষের জীবনবিধানের খুঁটিনাটি সকল ধারা-উপধারা বের করে আনার নামই হলো ইলমুল ফিকহ। যারা ফিকহশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করে কাঙ্ক্ষিত মানে উত্তীর্ণ হতে পারেন, তাদেরকে বলা হয় ফকীহ।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ফিকহ ও ফকীহগণের মর্যাদা ছিল আকাশচুম্বী। সাহাবীগণের মধ্যে যারা ফকীহ ছিলেন, তাদের কাছে অন্যান্য সাহাবী ও তাবিঈগণ ফতওয়া জিজ্ঞাসা করতেন এবং সেই ফতওয়া অনুসারে আমল করতেন। পর্যায়ক্রমে এই ফিকহী ধারা বিস্তার লাভ করে, মাসআলার জবাব খুঁজে বের করতে ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ শাস্ত্র বিধিবদ্ধ রূপ লাভ করে।

মুসলিমদের মধ্যে কিছু লোককে ফকীহ হওয়ার তাগিদ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

-তাদের (মুসলিমদের) প্রত্যেক গোত্র থেকে একদল লোক কেন (রাসূলের সঙ্গে) বের হয় না? যাতে তারা দীনের সঠিক বুঝ লাভ করতে পারে এবং ফিরে এসে নিজ গোত্রের লোকদের সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সতর্ক হয়। (সূরা তাওবাহ, আয়াত-১২২)

আল্লাহর বাণীর মর্ম হচ্ছে, কিছু লোক দীনের ফকীহ হয়ে নিজ গোত্রের লোকদেরকে সতর্ক করবে ও দীনের সঠিক জ্ঞানের আলোকে পরিচালিত করবে। সেই সঙ্গে গোত্রের লোকদেরকেও তাদের নির্দেশনা অনুসারে চলতে বলা হয়েছে। সুতরাং কিছু মানুষ দীনের পূর্ণাঙ্গ বুঝ অর্জন করবে, আর কিছু মানুষ তাদের শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে জীবন চালাবে- এটাই কুরআনের নির্দেশনা।

ফকীহগণের মর্যাদা সর্বমহলেই স্বীকৃত। বর্তমান সময়ের কিছু মানুষের কাছে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যে, কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসারেই আমল করতে হবে, ফকীহদের কথায় ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। আসলে তারা বুঝতেই চান না যে, ফকীহগণ কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসারেই ফিকহী সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ছাড়া ফকীহ হওয়া অসম্ভব এই বিষয়টা তারা বেমালুম চেপে যান। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা প্রাচীন যুগের প্রথিতযশা মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে ফকীহগণের মর্যাদা আলোচনার অভিলাষ পোষণ করছি। কেননা তাঁরাই ছিলেন হাদীসে নববীর প্রকৃত ধারক ও বাহক, তাঁদের মাধ্যমেই আমরা হাদীস জানতে পেরেছি।

ইলমে হাদীসের জগতে সুপরিচিত তাবিঈ সুলাইমান আল আমাশ (র.) ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর উস্তায। বুখারী-মুসলিমসহ সকল মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করল। তিনি জবাব দিতে পারলেন না। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)। তিনি অনুমতি নিয়ে জবাব দিলেন। আমাশ (র.) বিস্ময়াভিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোথায় পেয়েছ? আবূ হানীফা (র.) বললেন, কেন? আপনিই তো অমুকের সূত্রে অমুক থেকে এই হাদীস আমাকে শুনিয়েছেন! এভাবে তিনি একাধিক সূত্রে আমাশের হাদীসগুলো এক মুহূর্তেই তার সামনে তুলে ধরেন। আমাশ তখন বললেন,

أيها الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة

-ফকীহগণ! তোমরা হলে চিকিৎসক, আর আমরা ঔষধ বিক্রেতা। (আবূ নুআয়ম; মুসনাদ আবূ হানীফা, আল কামিল)

ঔষধ বিক্রেতার কাজ ঔষধ বিক্রি করা, আর ডাক্তারের কাজ হলো কোন রোগের জন্য কোন ঔষধ লাগবে তা নির্ধারণ করা। অনুরূপ মুহাদ্দিসগণের কাজ হাদীসের সনদ যাচাই-বাছাই করে মানুষের কাছে বর্ণনা করা, আর ফকীহগণের কাজ হলো কোন হাদীস দ্বারা কোন হুকুম নির্ধারণ করা হবে, কীভাবে নির্ধারিত হবে ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করে শরীআতের বিধান বর্ণনা করা।

ইমাম বুখারী (র.) কে বলা হয় "আমীরুল মুমিনিন ফিল হাদীস"। একইসঙ্গে ফিকহের ক্ষেত্রে তাকে একজন মুজতাহিদ মনে করা হয়। তাঁর সহীহ বুখারী গ্রন্থের রয়েছে বিশ্বজোড়া খ্যাতি। সহীহ বুখারীর পাঠক যদি একটু মনোযোগ দিয়ে ইমাম বুখারীর কিতাব সাজানোর পদ্ধতি লক্ষ্য করেন, তাহলে এই বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, সহীহ বুখারী মূলত ফিকহী নিয়মের আলোকেই রচিত। কেননা তিনি প্রত্যেক অধ্যায়ে বিভিন্ন তরজমাতুল বাব তথা শিরোনাম প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেই শিরোনামের অধীনে সংশ্লিষ্ট হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর শিরোনামসমূহ এক একটা ফিকহী সিদ্ধান্তের নির্যাস। এজন্যই মুহাদ্দিসগণের কাছে প্রসিদ্ধ একটা উক্তি হচ্ছে, تراجمه فقه البخاري في -বুখারীর ফিকহ তাঁর তরজমাতুল বাবে নিহিত।

এ সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) বলেন, "বুখারী (র.) এর উদ্দেশ্য কেবল হাদীস উল্লেখের সাথে সীমিত নয় বরং হাদীস থেকে বিধান বের করা ও তাঁর উদ্দিষ্ট বাবের উপর দলীল প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর লক্ষ্য। এজন্যই তিনি অনেক বাবে হাদীস উল্লেখ না করে সংক্ষেপে কেবল একথা বলেছেন যে, 'এতে অমুকের থেকে নবী ﷺ এর হাদীস রয়েছে' বা তিনি অনুরূপ কথা বলেছেন। কখনো বর্ণনাকারীদের নামের পরম্পরা তথা সনদ ছাড়া কেবল হাদীসের মূল ভাষ্য তথা মতন উল্লেখ করেছেন, কখনো হাদীসকে মু'আল্লাক হিসেবে (সনদের প্রথম দিকের রাবীদের নাম বাদ দিয়ে কেবল শেষ রাবীর নাম বহাল রেখে) উল্লেখ করেছেন; এসব করেছেন কেবল তরজমাতুল বাবে উল্লেখকৃত মাসআলার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে।" (ইবনু হাজার, হাদইউস সারী মুকাদ্দিমাতু ফাতহিল বারী, আর-রিসালাহ আল-আলামিয়্যাহ)

তাছাড়া সহীহ বুখারীর বিভিন্ন স্থানে তিনি বিভিন্ন ফিকহী মতামত তুলে ধরেছেন। সাহাবীদের মাযহাব, তাবিঈদের ফিকহী সিদ্ধান্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় প্রতিপক্ষের ফিকহী দলীল ও ইজতিহাদী যুক্তি খণ্ডন করেছেন। এসব কিছু প্রমাণ করে ইমাম বুখারী (র.) ইলমুল ফিকহ ও ফকীহগণের কদর করতেন।

সহীহাইন ছাড়া সিহাহ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী,

নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ (র.) সকলেই তাঁদের হাদীস গ্রন্থসমূহকে ফিকহের ধারাবাহিকতা অনুসারে সাজিয়েছেন। আর এজন্য এ চারটি গ্রন্থকেই 'আস-সুনান' বলা হয়। ইমাম আবূ দাউদ (র.) তাঁর সুনান গ্রন্থকে কেবল আহকাম সংশ্লিষ্ট হাদীসের মধ্যেই সীমিত রেখেছেন।

এই চারটি সুনান গ্রন্থের মধ্যে সুনানুত তিরমিযীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুনানুত তিরমিযীকে জামি'উত তিরমিযীও বলা হয়। ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীস বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ফকীহগণের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين.

-দুটো হাদীস ছাড়া এই কিতাবের সমস্ত হাদীস অনুসারে আমল করা হয় এবং এই হাদীসসমূহ দ্বারা আহলে ইলমের কেউ না কেউ দলীল দিয়েছেন।" (আল-ইলালুস সগীর)

হাদীসের সাথে ফকীহগণের সম্পর্ক বুঝাতে ইমাম তিরমিযী বলেন, **كذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث**- ফকীহগণ এমনটাই বলেছেন। আর হাদীসের মর্ম সম্পর্কে তারাই সবিশেষ জ্ঞাত। (জামিউত তিরমিযী, আবওয়াবুল জানাইয, বাবু মা জা-আ ফি গুসলিল মায়্যিতি)

এভাবে ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনান গ্রন্থের অসংখ্য জায়গায় ফকীহগণের বক্তব্য ও বিভিন্ন মাযহাবের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন। কোন পক্ষে অধিক ফকীহ রয়েছেন তাও উল্লেখ করেছেন, ফকীহগণের দলীল গ্রহণের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, কোন হাদীসের উপর সাধারণভাবে আমল প্রচলিত আছে ইত্যাদি অসংখ্য ফিকহী আলোচনায় ভরপুর কিতাব হলো জামিউত তিরমিযী। প্রাচীন যুগের এ সকল শীর্ষস্থানীয় হাদীসবিদের কর্মপদ্ধতি দেখে আমরা বুঝতে পারি তাঁরা ঠিকই ফকীহগণের কদর করতেন।

মদীনাবাসীর ইমাম বলে প্রসিদ্ধ প্রখ্যাত হাদীসবিদ ও মালিকী মাযহাবের স্বতন্ত্র মুজতাহিদ ইমাম মালিক (র.) বলেছেন, **ما كنا نأخذ (أي الحديث) إلا من الفقهاء.**-আমরা কেবল ফকীহগণের কাছ থেকেই হাদীস গ্রহণ করতাম। (কাযী ইয়ায, তারতীবুল মাদারিক)

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (র.) ছিলেন একজন হাদীস বিশারদ ও ইমাম বুখারীর উস্তায। তিনি ফকীহগণের কাছ থেকে ফায়দা হাসিল করতেন। তাঁর অনুসারীদের মাযহাবকে হাম্বলী মাযহাব বলা হয়। তিনি শাফিঈ মাযহাবের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস আশ-শাফিঈ (র.) সম্পর্কে বলেছেন,

وإني لأدعو للشافعي منذ أربعين سنة في الصلاة

অর্থাৎ আমি নামাযে চল্লিশ বছর যাবত শাফিঈর জন্য দুআ করছি। (খতীব বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল আল বাযযায বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, আমি ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) একবার হজ্জে গিয়ে একই স্থানে অবস্থান করেছি। ফজরের নামায শেষে আমি আহমাদ ইবনে হাম্বলের খোঁজে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার মজলিসে এবং আরো অন্যান্য মুহাদ্দিসের মজলিসে গেলাম। অবশেষে তাঁকে একজন আরবী যুবকের মজলিসে পেলাম। ভিড় ঠেলে আমি তাঁর নিকট গিয়ে বসলাম এবং বললাম, আপনি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার মজলিস ছেড়ে এখানে এসে বসেছেন! অথচ তাঁর নিকট যুহরী, আমর ইবনে দীনার ও যিয়াদ ইবনে ইলাকাহ প্রমুখ এমন অসংখ্য তাবিঈ'র হাদীস রয়েছে, যাদের সংখ্যা আল্লাহই ভালো জানেন। একথা শুনে আহমাদ (র.) বললেন,

اسكت، فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك في دينك ولا في عقلك وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة، ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى القرشي ، قلت : من هذا؟ قال : محمد بن إدريس الشافعي.

-চুপ থাক, যদি উচ্চ সনদের কোন হাদীস তোমার হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে নিম্ন সনদে হলেও তুমি তা পেয়ে যাবে। এতে তোমার দীন ও জ্ঞানবুদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কিন্তু এই যুবকের জ্ঞানবুদ্ধি যদি তোমার হাতছাড়া হয়, তবে আমার আশংকা হয় কিয়ামত পর্যন্ত তুমি তা কোথাও পাবে না। আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে এই কুরাইশী যুবকের চেয়ে বেশি সমঝদার আর কাউকে আমি পাইনি। আমি বললাম, তিনি কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ শাফিঈ। (আব্দুর রহমান ইবনু আবি হাতিম, আল জারহু ওয়াত তাদীল, বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী)

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তাযের উস্তায সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা (র.) ছিলেন অনেক উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস। তিনি বলেছেন, **الحديث مضلة إلا للفقهاء**-ফকীহগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য হাদীস অনেক সময় বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (ইবনুল হাজ্জ মালিকী, আল মাদখাল)

তিনি আরো বলেছেন, **التسليم للفقهاء سلامة في الدين**। অর্থাৎ ফকীহগণের হাতে নিজেকে ন্যস্ত করাই নিজ দীন কে নিরাপদ রাখার উপায়। (তারীখে বাগদাদ)

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র.)-এর নাম শুনেনি ইলমে হাদীসের এরকম কোনো ছাত্র নেই। তিনি বলেছেন,**لولا أن الله أغاثني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس**-আল্লাহ যদি আমাকে আবূ হানীফা ও সুফিয়ান (সাওরী) (র.) এর মাধ্যমে রক্ষা না করতেন, তবে আমি অন্যান্য মানুষের (মুহাদ্দিসের) মতো হয়ে থাকতাম। (খতীব বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ)

আবুয যিনাদ আব্দুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান (র.) ছিলেন ইমাম মালিক (র.)-এর শিক্ষক ও হযরত আনাস (রা.) -এর শিষ্য। তিনি বলেছেন,

وأيم الله إن كنا لنلتقط السنة من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آي القرآن

-আল্লাহর কসম, আমরা ফকীহ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের নিকট থেকে সুন্নাহ ও হাদীস সংগ্রহ করতাম এবং কুরআনের আয়াতসমূহ যেভাবে শেখা হয় সেভাবে তা শিখতাম। (ইবনে আব্দুল বার, জামি'উ বায়ানিল ইলম)

হিলাল ইবনে খাব্বাব বলেন, আমি সাঈদ ইবনে যুবায়ের (র.) কে জিজ্ঞেস করলাম,

ما علامة هلاك الناس ؟ قال : إذا هلك فقهاءهم -মানুষের ধ্বংস হওয়ার আলামত কী? **هلكوا** তিনি বললেন, যখন তাদের ফকীহগণ মৃত্যুবরণ করবে, তখন তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। (খতীব বাগদাদী, আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ)

ফকীহগণের মর্যাদা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের সকল বক্তব্য পেশ করতে হলে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বুঝতে উপরের আলোচনা একটা প্রাথমিক জ্ঞান লাভে সহায়ক হবে। বিস্তারিত জানতে ফকীহগণের কর্মপদ্ধতি নিয়ে পড়াশোনা করা যেতে পারে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।

কুরআন-সুন্নাহ-এর আলোকে দাঈর গুণাবলি

সমকালীন দাঈদের দৃষ্টি আকর্ষণ

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

ইসলাম চির শান্তি ও প্রগতির ধর্ম। মানুষকে ইসলামের কল্যাণের পথে আহ্বান করতে মহান আল্লাহ যুগে যুগে অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। পৃথিবীতে ইসলামের প্রচারণা শুরু হয় হযরত আদম (আ.) এর মাধ্যমে। ইসলাম পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর মাধ্যমে। ইসলাম শুধু ধর্ম হিসেবেই আবির্ভূত হয়নি, বরং জীবন বিধান হিসেবেও অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলাম একটি গতিশীল ধর্ম। কিয়ামত পর্যন্ত এ ধর্মের সৌন্দর্য ও উপযোগিতায় বিন্দুমাত্র হ্রাস ঘটবে না।

ইসলামে গোটা বিশ্ববাসীর উন্নতি ও সমৃদ্ধি নিহিত। কোনো সৃষ্টিই ইসলামের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত নয়। মানবজাতি তখনই ইসলামের পূর্ণ কল্যাণ লাভে ধন্য হবে যখন সবাই ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মেনে নিবে, এর আদেশ নিষেধ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রতিপালন করবে। এ জন্য ইসলামের দাওয়াত ও তা'লীম পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। কুরআন এবং হাদীসে এ ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং মহানবী ﷺ এর হাদীসে ইসলাম প্রচারের তাৎপর্য, ইসলাম প্রচারকের মর্যাদা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে।

প্রতিটি মুসলিমই যে যার অবস্থানে থেকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করবে। প্রজ্ঞা ও চারিত্রিক মাধুর্যতা দিয়ে মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করবে। তবে কুরআনের নির্দেশনা হচ্ছে, প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কিছু বিশেষ ব্যক্তি থাকবেন, যারা গোটা জাতিকে সৎ পথের সন্ধান বাতলে দিবেন। মহান আল্লাহ আল কুরআনুল কারীমে বলেন, "তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানের অনুশীলন করতে পারে, এবং ফিরে আসার পর তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা অসদাচরণ থেকে বিরত হয়।" (সূরা তাওবাহ, আয়াত-১২২)

মহান আল্লাহ উপরে উল্লিখিত আয়াতে প্রতি সম্প্রদায় থেকে একটি অংশকে দ্বীনের দাঈ (ইসলামের পথে আহ্বানকারী বা ইসলাম প্রচার-প্রসারের মহান কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি) হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেহেতু কওমের একটা অংশকে দাওয়াতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাই দ্বীনের গভীর জ্ঞান থাকা তাদের জন্য অপরিহার্য। উল্লিখিত আয়াতে সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বীনের পাণ্ডিত্য অর্জনের পাশাপাশি চারিত্রিক কিছু গুণাবলি অর্জনও দাঈর জন্য জরুরী। মহানবী ﷺ এর চারিত্রিক মাধুর্যতা অসংখ্য সাহাবীর ইসলাম গ্রহণের কারণ হিসেবে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে যারা ইসলামের আলো দিকদিগন্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও সকলকেই মোহাচ্ছন্ন করত, যা ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও বিস্তৃতির অন্যতম কারণ।

বর্তমান সময়ে আমাদের দ্বীন প্রচারের অন্যতম মাধ্যম ওয়ায-মাহফিল বা ধর্মীয় সভা। সারা বছরই আমাদের দেশে বিভিন্ন নামে ছোট বড় ওয়ায-মাহফিল চলতেই থাকে। তা সত্ত্বেও সমাজের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে না। মানুষের অপরাধ প্রবণতা কমছে না। মানুষ ধর্মমুখী হওয়ার পরিবর্তে ক্রমেই ধর্ম বিমুখ হয়ে পড়ছে। অনেক বিশ্লেষকই এজন্য দাঈদের অযোগ্যতা, অসততা ও চারিত্রিক ত্রুটিকে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে মনে করে থাকেন। যে কারণে দাঈদের যোগ্যতা ও গুণাবলি কী হওয়া উচিত এ বিষয়ে গবেষণা সময়ের দাবি। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের সমকালীন প্রেক্ষাপটে দাঈদের গুণাবলি আলোচনা করা হয়েছে।

দাঈর গুণাবলি

১. ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শীতা

ধর্মীয় জ্ঞান অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও ফিকহের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ব্যতীত কারো পক্ষেই ইসলামকে স্বমহিমায় মানুষের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ মহানবী ﷺ এর উপর সর্বপ্রথম অবতরণ করেন 'ইকরা' বা 'পড়'। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ সকল দাঈকে এ বার্তাই দিয়েছেন যে, দাওয়াতের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে অবশ্যই দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। নবীগণকেও মহান আল্লাহ প্রথমেই ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী করার পর দাওয়াতী দায়িত্ব পালনে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, হযরত ইউসুফ (আ.) এর ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে,

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْا إِلَى اللهِ– عَلٰى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ–

-বলুন, এটাই আমার পথ, আল্লাহর পথে আহ্বান জানাচ্ছি, আমি ও আমার অনুসারীরা, স্পষ্ট জ্ঞানের মাধ্যমে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত-১০৮)

বর্তমান সময়ের দাঈদের একটা বড় অংশের মাঝেই ধর্মীয় জ্ঞানের অপরিপক্কতা বেশ লক্ষণীয়। যে কারণে অনেক আলোচকই ভুল ও খণ্ডিতভাবে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন। অজ্ঞতার কারণে অনেক আলোচককে ভুল ফাতওয়া প্রদান করতেও দেখা যায়। যা সামগ্রিকভাবে অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২. চারিত্রিক মাধুর্যতা

মানুষের চরিত্রের দুটি দিক, ভালো ও মন্দ। একজন দাঈর জন্য চরিত্রের ভালো দিকগুলো অনুশীলন করা অপরিহার্য। মহানবী ﷺ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাঈ। তাঁর চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন, "আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত" (সূরা কলম, আয়াত-৪)। এ পৃথিবীতে মহানবী ﷺ এর অবির্ভাবের অন্যতম কারণ মানুষকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া। মহানবী ﷺ বলেন, "আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি" (আস-সুনান আল-কুবরা লিল বায়হাকী, হাদীস নং ৮৯৪৯)। উত্তম চরিত্র অবলম্বনের গুরুত্ব বুঝাতে মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট।" (বুখারী, হাদীস নং ৩৫৫৯)

৩. ধৈর্য ও অবিচলতা

যেকোনো কাজে সাফল্য লাভের অন্যতম শর্ত ধৈর্য ও অবিচলতা। প্রত্যেক দাঈর জন্য ধৈর্যশীল হওয়া অপরিহার্য। কোনো কওমই এক বাক্যে তাওহীদের মূলনীতি গ্রহণ করেনি। বরং বিরোধিতা করেছে। ইসলামের পক্ষে দাওয়াত দানকারীকে নানাভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। দাওয়াতী কাজে বিপদাপদ আসা নতুন কোনো বিষয় নয়। নূহ (আ.) থেকেই শুরু হয়েছে এর ইতিহাস। সালিহ (আ.),

ইবরাহীম (আ.), মূসা (আ.), শুআয়ব (আ.), ইলিয়াস (আ.), ঈসা (আ.) এবং শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ সকলেই যুলম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং ধৈর্যধারণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে সে সকল নবীগণের ধৈর্যের ইতিহাস বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন: "তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে–যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ অবস্থা আসেনি ? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল এবং তাঁর সঙ্গে ঈমান আনয়নকারীগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রাখ! অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটে।" (সূরা বাকারা, আয়াত-২১৪)

বর্তমান যুগের দাঈদেরও নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে তাদেরও নবী-রাসূলগণের ন্যায় ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে। তবেই প্রকৃত দ্বীন প্রচারে সাফল্য আসবে।

৪. ত্যাগের মানসিকতা

ইসলামের প্রচার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ত্যাগ ও কুরবানী ছাড়া এ কাজে সফল হওয়া যায় না। নবীগণের (আ.) জীবনীতে আমরা এর উদাহরণ পাই। পবিত্র কুরআনে নূহ (আ.) এর কাহিনী বর্ণনা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "তিনি (নূহ) বলেছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহ্বান করেছি। কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।" (সূরা নূহ, আয়াত-৫) এ আয়াতগুলোই প্রমাণ করে হযরত নূহ (আ.) ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে দিন-রাত মানুষের কাছে গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত প্রচার করেছেন।

মুহাম্মদ ﷺ এর দাওয়াতী জীবনও ছিল অনেক ত্যাগ ও কুরবানীর। ভোগ-বিলাসের লেশ মাত্রও ছিল না তাঁর দাওয়াতী জীবনে। ভোগ নয় ত্যাগই ছিল তাঁর জীবনের মহান আদর্শ। মক্কায় তাঁর দাওয়াতী মিশনকে থামিয়ে দেয়ার জন্য যখন কাফিরদের সকল কৌশল ব্যর্থ হয়েছিল তখন মক্কার কুরাইশরা অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে তাঁকে ফিরাতে চেষ্টা করল। রাসূল ﷺ পরিষ্কার করে তাদের জানিয়ে দিলেন, "চাচাজান, আল্লাহর শপথ! যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় তবুও শাশ্বত এ মহা সত্য প্রচার সংক্রান্ত আমার কর্তব্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আমি বিচ্যুত হব না। এ মহামহিম কার্যে হয় আল্লাহ আমাকে জয়যুক্ত করবেন, না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু আমি কখনই এ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব না।" (সফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১২১)

৫. তাকওয়া ও ইখলাস

দাওয়াতী কাজে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাকওয়া ও ইখলাস। ইসলামে এ বিষয় দুটি এতটাই গুরুত্ব বহন করে যে, এগুলো ব্যতীত মানুষের কোনো ভাল কাজই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে কবূল হয় না। সহীহ বুখারীতে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, নিয়ত অনুযায়ী সমস্ত কাজের ফলাফল হবে। প্রত্যেকেই যে উদ্দেশ্যে কাজ করবে সে তাই পাবে।" (বুখারী, হাদীস নং ০১)

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল দ্বীনকে কেবল তারই জন্য নিবেদিত করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়িম করতে ও যাকাত দিতে, এটাই সঠিক দ্বীন।" (সূরা বায়্যিনাহ, আয়াত-৫)

উপরে উল্লিখিত হাদীস ও আয়াতসমূহে একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সকল কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বস্তুত ইখলাস ও জাগতিক স্বার্থ তথা ব্যক্তি স্বার্থ, দলীয় স্বার্থ কিংবা অন্য কোনো স্বার্থ পরিহার ব্যতীত যতই দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা হোক না কেন, এতে সফল্য আসার সম্ভাবনা নেই। আর বর্তমানে অগ্রিম টাকা নিয়ে, দর কষাকষি করে অধিক অর্থ উপার্জনের যে মহোৎসব চলছে এর দ্বারা টাকা পয়সা রোজগার এবং আলীশান জীবন যাপন ছাড়া প্রকৃত ইসলাম প্রচারের কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

৬. পরমত সহিষ্ণুতা ও আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখা

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ মু'মিনদের গুণাবলি বর্ণনা করে বলেন, "যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৩৪) অসহিষ্ণুতা সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি বিনষ্টের অন্যতম প্রধান কারণ। একটা সমাজে নানা ধর্ম, চিন্তা ও মতের মানুষের বসবাস। প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ ধর্ম, চিন্তা ও মতকে সঠিক ও সর্বোত্তম বলে মনে করে। এক্ষেত্রে সকল দাঈর কর্তব্য ভিন্ন মত বা ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভতিশীল থাকা। এমনকি তাদের পক্ষ থেকে ইসলাম প্রচারে বিরোধিতা করা হলেও সহিষ্ণু আচরণ করা।

৭. বিনয় ও নম্রতা

সচ্চরিত্রভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি বিনয় ও নম্রতা। ইসলাম মানুষকে বিনয়ী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মহানবী ﷺ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বিনয় অবলম্বন করতেন। দাওয়াতের অন্যতম কৌশল দাওয়াতী কার্যক্রমে বিনয় অবলম্বন করা। কুরআনের একাধিক আয়াতে বিনয় অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"(হে রাসূলুল্লাহ ﷺ) আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের প্রতি কোমলহৃদয় হয়েছিলেন। তা না হয়ে আপনি যদি তাদের প্রতি রূঢ় ও কঠোর হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার আশপাশ হতে সরে পড়তো। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। (পরামর্শ শেষে) আপনি কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হলে আল্লাহর উপর ভরসা করুন। যারা (আল্লাহর উপর) ভরসা রাখে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৫৯)

৮. মার্জিত শব্দ ব্যবহার করা

দাওয়াতের ক্ষেত্রে দাঈর ভাষাগত বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে দাঈর উচিত মাতৃভাষায় মার্জিত শব্দে সুস্পষ্ট ও সহজভাবে দ্বীনের দাওয়াত উপস্থাপন করা। মহানবী ﷺ ধীরে-সুস্থে উপদেশ দিতেন। এতই ধীরে যে, ইচ্ছে করলে কেউ তাঁর প্রতিটি কথা গণনা করতে পারতেন (সহীহ বুখারী)। কুরআনে বক্তৃতা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে কথা বলার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হযরত লুকমান (আ) তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়েছেন,

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

-কথা বল নিচুস্বরে। জেনে রেখ, নিশ্চয় গাধার কণ্ঠই সবচেয়ে অপ্রিয়। (সূরা লুকমান, আয়াত-১৯)

৯. অশ্লীল, অশোভন ও অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা

দাওয়াতের ক্ষেত্রে অশোভন, অপ্রাসঙ্গিক ও অনর্থক কথা বর্জন জরুরী। অপ্রাসঙ্গিক, অনর্থক কথার কারণে অনেক সময়ই মূল বক্তব্য হারিয়ে যায়। শ্রোতা এতে করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যে কারণে নবীজী ﷺ অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আলী (যাইনুল আবেদীন) ইবনুল হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اِنَّ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ

-কোনো ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো অর্থহীন কথা বা কাজ ত্যাগ করা। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৩১৮)

বর্তমান সময়ের অনেক আলোচককে বক্তব্যের মাঝে অশ্লীল বাক্য, সিনেমার গান ও ডায়লগ ইত্যাদি ব্যবহার করতে দেখে যায়। কেউ কেউ যৌন ইঙ্গিতমূলক গল্প-কৌতুকও বলে থাকেন। এর কোনোটাই ইসলাম সমর্থন করে না। মহানবী ﷺ বলেন, মুমিন কখনো দোষারোপকারী, অভিশাপদাতা, অশ্লীলভাষী ও গালাগালকারী হয় না। (তিরমিযী, হাদীস নং ২০৪৩)

১০. ব্যক্তি জীবনে ধর্ম পালনে অভ্যস্ত হওয়া

ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ থাকতে হবে দাঈর নিজের ব্যক্তি জীবনে। তারা তাদের জীবন পরিচালনা করবেন কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ মোতাবেক। দাঈগণ তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল সৎ গুণের অনুশীলন করবেন এবং অন্যায় আচরণ থেকে দূরে থাকবেন। দাঈগণ লোক দেখানো বা সামাজিকতার জন্য দ্বীন পালন করতে পারে না। ইসলামের বিধি-বিধান পালন করাকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানাতে হবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে কথা ও কাজে মিল প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, "তোমরা কি মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দাও এবং তোমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর। তাহলে কি তোমরা বুঝো না?" (সূরা বাকারা, আয়াত-৪৪)

১১. বোধগম্যতার জন্য শ্রোতাদের অবস্থা বিবেচনা করা

দাঈ নিজের পাণ্ডিত্য বা গভীরতা প্রকাশের জন্য সবার কাছে একই রকম প্রচার চালাবে না। বরং মানুষের গ্রহণ করার ক্ষমতা বিবেচনা করবেন। যারা জ্ঞানী তাদের নিকট দার্শনিক তত্ত্ব বা জ্ঞান আলোচনা করবেন। পক্ষান্তরে, কম শিক্ষিতদের সামনে তুলনামূলক সহজ বিষয়, সহজভাবে আলোচনা করবেন। হযরত আয়িশা (রা.) বলেছেন :

امر رسول الله صلى الله عليه وسلمَ ان ننزل الناس منازلهم–

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, আমরা যেন মানুষকে যথাযথ মর্যাদার স্থানে রাখি। (ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা)

এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, দাওয়াহ গ্রহণে আগ্রহী তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ লোককে দাওয়াহ গ্রহণে অনাগ্রহী তুলনামূলক বেশি গুরুত্বপূর্ণ লোককে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। বরং আগ্রহী লোকই বেশি গুরুত্ব পাবে। তাকে কোনোক্রমেই অবজ্ঞা বা অবহেলা করা যাবে না। কাজেই ব্যক্তির অবস্থান ও যোগ্যতা অনুসারে তার উপযুক্ত ভাষা ও পদ্ধতিতে তার নিকট দাওয়াহ উপস্থাপন করতে হবে।

১২. সততা অবলম্বন এবং বানোয়াট বক্তব্য পরিহার করা

দাঈ বিশ্বস্ত হবেন। যে কোনো তথ্য ও লেনদেনে মানুষ তার ওপর আস্থা রাখবে। তিনি তার ব্যক্তি জীবনে যেমনিভাবে সততা অবলম্বন করবেন, অনুরূপভাবে দাওয়াতের ক্ষেত্রেও সততা অবলম্বন করবেন। মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য বা নিজ দলের প্রচারণার স্বার্থে বানোয়াট কোনো বক্তৃতা প্রদান করবে না। মহান আল্লাহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সততা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

-হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। (সূরা আহযাব, আয়াত-৭০)

হাদীস বর্ণনা, কুরআনের তাফসীর করা, ফিকহী মাসআলা আলোচনাসহ সকল ক্ষেত্রেই সততা অবলম্বন করতে হবে। কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করা যাবে না, বরং সাহাবী, তাবিঈ বিখ্যাত ইমাম ও পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বর্তমান সময়ের উপযোগী করে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

১৩. গীবত চর্চা না করা

ইসলামী শরীআতে গীবত বা পরনিন্দা করা অবৈধ। আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

-আর তোমরা একে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে ভালোবাসবে? বস্তুত তোমরা নিজেরাই তা অপছন্দ করে থাকো। (সূরা হুজরাত, আয়াত-১২)

গীবত করাকে আল-কুরআনে নিজ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং গীবত খুবই অপছন্দনীয় কাজ। সুস্থ বিবেকবান কোনো মানুষেই এরূপ কাজ পছন্দ করতে পারে না। আল্লাহ তাআলাও গীবত করা পছন্দ করেন না।

পবিত্র হাদীসে মহানবী ﷺ আমাদের গিবতের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গীবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! গীবত কিভাবে ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক অপরাধ হয়? রাসূল ﷺ বললেন, কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তাওবা করলে আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দেন। কিন্তু গীবতকারীকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ মাফ করেন না যতক্ষণ না যার গীবত করা হয়েছে সে ব্যক্তি মাফ করবে। (বায়হাকী)

১৪. আত্মসমালোচনা

চরিত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে আত্মসমালোচনা একটি কার্যকর উপায়। মানুষকে সঠিক পথ ও সংশোধনের রাস্তা দেখাতে আত্মসমালোচনার ভূমিকা অনন্য। আত্মসমালোচনা করলে নিজের ভুল ধরা পড়ে এবং পরবর্তী সময় সে ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক কাজটি করতে পারে। যে ব্যক্তি নিজের দোষ-ত্রুটি, অন্যায় নিজে বিচার করে, সে কখনো আত্মপ্রীতি ও আত্মম্ভরিতার শিকার হতে পারে না। নিজের গুনাহের কথা যে চিন্তা ও হিসাব করে সে ব্যক্তি সহজে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারে। আত্মসমালোচনার গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ– وَاتَّقُوا اللهَ– إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

-হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেকেই চিন্তা করে দেখুক, আগামীকালের জন্য সে কী (পুণ্য কাজ) অগ্রিম পাঠিয়েছে। (সূরা হাশর, আয়াত-১৮)

সমকালীন দাঈদের মধ্যে আত্মসমালোচনার প্রবণতা নেই বললেই চলে। বরং অধিকাংশকেই পরনিন্দা চর্চা করতে দেখা যায়। এর ফলে দাঈদের চারিত্রিক ত্রুটি দূর হচ্ছে না। ভয়ংকর বিষয় হচ্ছে, দাঈদের পরনিন্দার প্রবণতায় ভয়াবহ সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে এবং কলহে রুপ নিচ্ছে দাঈদের পারস্পরিক বিদ্বেষ।

উপসংহার

ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি কাজ দ্বীনের দাওয়াত। এটি বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ প্রদত্ত একটি দায়িত্বও বটে। যে দায়িত্ব যুগে যুগে নবী রাসূলগণ এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দগণ নিঃস্বার্থভাবে পালন করে এসেছেন। দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে নানা কারণেই সৎ, দক্ষ ও যোগ্য দাঈ সৃষ্টি হচ্ছে না। অনেকেই দাওয়াতী কার্যক্রমকে লাভজনক পেশা হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেছেন। যে কারণে ইসলামের মর্মবাণী সাধারণ মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারছে না। এ অবস্থায় দাঈদের আবশ্যক কর্তব্য তাদের জ্ঞানগত অযোগ্যতা দূরীকরণে সর্বাত্মক চেষ্টা করা। নিজেদর লোভ-লালসাসহ অন্যান্য চারিত্রিক ত্রুটি সংশোধন করা। এর পাশাপাশি দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে নবীজী (সা.), সাহাবী, তাবিঈসহ ওলী-আউলিয়ার নীতি আদর্শ অনুশীলন করা। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের জন্য আদর্শ দাঈ হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

ব্যভিচার প্রতিরোধে করণীয়

মোস্তফা মনজুর

১. মোটিভেশন (প্রণোদনা)

আখিরাতের শাস্তির ভয়, জান্নাতের নিআমতের আশা হচ্ছে মানসিক পরিবর্তনের মূল উপাদান। এতে প্রথম শ্রেণির মানুষ যেমন নিজেকে ধরে রাখতে পারে তেমনই দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মানুষ পারে নিজেদেরকে পরবর্তী স্তরে উন্নীত করতে। বিশেষ করে প্রথম শ্রেণির মানুষ জান্নাতের আশা দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। কেননা তাঁরা স্বভাবতই পাপ থেকে বিরত থাকেন। ফলে জাহান্নামের ভয়ের চাইতে জান্নাতের আশাই তাদের জন্য বেশি কার্যকর। এ ছাড়া আরো একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর তা হচ্ছে আল্লাহর মহব্বত। এ পর্যায়ের মানুষ (প্রথম শ্রেণির সবচেয়ে উঁচু স্তর) আল্লাহর মহব্বত ও সন্তুষ্টিকেই বেশি প্রাধান্য দেন। তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইরে কিছু করার কথা চিন্তাও করেন না। সেক্ষেত্রে পরকালীন জীবন সম্পর্কে ইসলামের বয়ান তাদের জন্য খুবই উপকারী, সন্দেহ নেই।

মোটিভেশন এর ক্ষেত্রে ইসলামী নির্দেশনা অনেক। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সব উল্লেখ না করে দুএকটি করছি। সবচেয়ে বড় প্রণোদনা হচ্ছে, ইসলামে যিনা সুস্পষ্ট হারাম ও খুবই নিন্দনীয় অপরাধ। মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, 'আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ' (সূরা বনী ইসরাঈল-৩২)। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, আল্লাহর বাণী 'যিনা (ব্যভিচার) করো না' এর চেয়ে 'যিনার কাছেও যেয়ো না' অনেক বেশি কঠোর বাক্য। অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তি যিনা করা তো দূরের কথা যিনার কল্পনাও করতে পারে না। এমনকি যিনার সহযোগী ও যিনার পর্যায়ভুক্ত কোনো কিছুর কাছেই যেতে পারে না। কেননা এসবকিছুই হারাম। বস্তুত আল্লাহ তাআলার নির্দেশই অনেক মানুষের জন্য যথেষ্ট। তারপরও আল্লাহ তাআলা এহেন মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার পুরস্কার হিসেবে প্রণোদনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আর তারা নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহকে সংযত রাখে, তাদের স্ত্রী ও তারা যাদের মালিক হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ছাড়া, এতে তারা নিন্দিত হবে না। সুতরাং কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী; এবং যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান থাকে তারাই হবে উত্তরাধিকারী; উত্তরাধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা স্থায়ী হবে"(সূরা মুমিন-৫-১১)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিস (জিহ্বার) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী জিনিস (যৌনাঙ্গ) এর নিশ্চয়তা (সঠিক ব্যবহারের) দেবে আমি তার বেহেশতের নিশ্চয়তা দিব" (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবু হিফযিল লিসান)।

হযরত সাঈদ ইবনে যায়িদ (রা.) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, 'সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি নিহত হয়েছে, সে শহীদ। জীবন রক্ষা করতে গিয়ে যে নিহত হয়েছে, সে শহীদ। দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে যে নিহত হয়েছে, সেও শহীদ। আর সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে যে নিহত হয়েছে, সেও শহীদ।' (আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবুন ফি কিতালিল লাসূস)। সুবহানাল্লাহ, কত বড় প্রণোদনা। নিজের ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যু হলেও তা আখিরাতে বিশাল প্রতিদানের উপলক্ষ্য হয়ে যাচ্ছে।

ভয়ের দ্বারা মানুষকে যিনা থেকে বিরত রাখার কথাও ইসলাম বিবেচনায় এনেছে। এজন্য হাদীসে এসেছে- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি স্বপ্নে একটি চুলা দেখতে পেলাম যার উপরের অংশ ছিল চাপা আর নিচের অংশ ছিল প্রশস্ত আর সেখানে আগুন উত্তপ্ত হচ্ছিল, ভিতরে নারী পুরুষরা চিৎকার করছিল। আগুনের শিখা উপরে আসলে তারা উপরে উঠছে, আবার আগুন স্তিমিত হলে তারা নিচে যাচ্ছিল, সর্বদা তাদের এ অবস্থা চলছিল, আমি জিবরাইল (আ.) কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিবরাইল (আ.) বললেন, তারা হলো, অবৈধ যৌনাচারকারী নারী ও পুরুষ (বুখারী, বাবু তা'বিরুর রুইয়া বা'দা সালাতিস সুবহ)।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, ব্যভিচারের মন্দ পরিণাম ছয়টি। তিনটি দুনিয়ায় আর তিনটি আখিরাতে। দুনিয়ার তিনটি হলো- ১. চেহারার সৌন্দর্য নষ্ট হওয়া ২. দরিদ্রতা ও ৩. অকাল মৃত্যু। আর আখিরাতের তিনটি হলো- ১. আল্লাহর অসন্তুষ্টি ২. হিসাব-নিকাশের কঠোরতা ও ৩. জাহান্নামের কঠিন শাস্তি।

২. মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা

মানসিকতার পরিবর্তন এ সমস্যা সমাধানের অন্যতম প্রধান উপায়। মোটিভেশনের মাধ্যমে যেমন মানুষের মানসিক অবস্থা স্থায়ীভাবে পরিবর্তন হতে পারে, তেমনই তা সাময়িকও হতে পারে। কেননা মোটিভেশনের প্রভাব চলে গেলেই নফসে আম্মারার প্রভাব কার্যক্ষম হয়ে উঠতে পারে। এমতাবস্থায় স্থায়ী সমাধান হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা কার্যকরী। আমাদের প্রিয় নবীজী ﷺ এ বিষয়ে সঠিক নির্দেশনাই আমাদের দিয়ে গিয়েছেন।

হাদীসে এসেছে, একদা এক যুবক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ব্যভিচারের অনুমতি চাইলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমার মা, মেয়ে, বোন, ফুফু ও খালার সঙ্গে কেউ এমন করুক এটা কি তুমি পছন্দ করবে? সে বলল, না, এটা কেউ পছন্দ করবে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তেমনিভাবে কোনো মানুষই তার আপনজনের সঙ্গে ব্যভিচার করা পছন্দ করবে না। অতঃপর তিনি তার পাপমুক্তি ও আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য দুআ করেন (মুসনাদ আহমদ, মুসনাদুল আনসার)। উল্লেখ্য যে, এরপর ব্যভিচারের চাইতে খারাপ পাপ সে যুবকের জন্য আর কিছু ছিল না।

এখানে লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবকের ইচ্ছার কথা শুনে তাকে ধমক দেননি, মুখ ফিরিয়ে নেননি। বরং তাকে সময় দিয়েছেন; সুন্দর করে যুক্তি দিয়ে তাকে বুঝিয়েছেন, অতঃপর তার জন্য দুআ করেছেন। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝানোর ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত বলেননি, মোটা মোটা তত্ত্বকথাও বলেননি; কেননা তিনি ছিলেন মানবতার চিকিৎসক। তিনি যুবকের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। এজন্য সুন্দর করে, তার উপযোগী করে কোমল ভাষায় যুক্তির মাধ্যমে তার চিকিৎসা করেছেন। হ্যাঁ, আমি চিকিৎসার স্বার্থে কুরআন হাদীসের উক্তি উল্লেখ না করার কথা বলছি না। বরং বলছি, মানসিক অবস্থা বিবেচনা করার কথা। অনেক মানুষের ক্ষেত্রে (বিশেষ করে, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণির ক্ষেত্রে) কুরআনের একটি আয়াত বা হাদীসের বাণী খুবই কার্যকর। তবে তৃতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে যুক্তি আর উদাহরণ অনেক বেশি কার্যকর। অতএব চিকিৎসাক্ষেত্রে এসব কিছুই বিবেচনা করা আবশ্যক।

আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি বিষয় নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে দেখি। বিশেষত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। আর তা হচ্ছে, নিজের সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে ধর্ষকের প্রতি কোনো নারীর বক্তব্য "তোমার কি মা-বোন নেই"। প্রিয় পাঠক, এ বক্তব্য কিন্তু হাদীসের বাক্যের

দ্বারা সমর্থিত। কোনো বিবেকবান মানুষই এ কথার পর অপরাধ করার কথা চিন্তাও করতে পারেনা। হ্যাঁ, নফসে আম্মারা দ্বারা প্রভাবিত পশুত্বের পর্যায়ের মানুষের কাছে অবশ্য এসবের কোনো দাম নেই।

৩. প্রভাবকের নিয়ন্ত্রণ

সামাজিক নানা প্রভাবকের নিয়ন্ত্রণ এ সমস্যা সমাধানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের গ্রহণীয় সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগ শুধু এর অভাবেই ব্যর্থ হচ্ছে। কেননা আমরা সমাজের নানা প্রভাবককে নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টাই করছি না। অথচ প্রভাবকের নিয়ন্ত্রণ তিন প্রকার মানুষেরই মানসিক অবনমন ঠেকিয়ে রাখে। এক্ষেত্রে ইসলামের মূল নির্দেশনাগুলো নিম্নরূপ-

অশ্লীলতা হারাম

প্রভাবক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইসলামের সর্বপ্রধান ঘোষণা হলো সকল প্রকার অশ্লীলতা, অশালীনতা হারাম। এর জন্য পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। মহান আল্লাহ সতর্ক করে দিয়েছেন, 'যারা ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতার বিস্তারে উৎসাহী তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' (সূরা নূর-১৯)। সুতরাং যারা নানাভাবে সমাজে অশ্লীলতার বিস্তার করছেন, হোক তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, বা সিনেমা, টিভি, মিডিয়া দ্বারা, কিংবা লিখনের মাধ্যমে, তাদের সতর্ক হওয়া উচিত। আমাদের সমাজ কতভাবেই না অশ্লীলতায় লিপ্ত। নাটক-সিনেমা, গান, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, ফ্রেন্ডশিপ সংস্কৃতি (বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড, জাস্টফ্রেন্ড), নানা দিবস উদযাপন (ভ্যালেন্টাইন ডে, থার্টি ফার্স্ট নাইট ইত্যাদি), অশ্লীল সাহিত্য, পর্ণগ্রাফি ইত্যাদি দিন দিন বেড়েই চলেছে। বৃদ্ধ থেকে শিশু পর্যন্ত কেউই এসবের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। অথচ এসবই সম্পূর্ণরূপে হারাম।

ইসলাম যিনা ও অশ্লীলতার একটি ব্যাপকতর সংজ্ঞাও নির্ধারণ করেছে। এতে শুধুমাত্র দৈহিক মিলনই যিনা নয়; বরং এ লক্ষ্যে যাবতীয় কাজই এক একটি যিনা। স্পষ্ট ভাষায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মানুষ তার সমগ্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যিনা করে। দেখা হচ্ছে চোখের যিনা, ফুসলানো কণ্ঠের যিনা, তৃপ্তির সাথে কথা শোনা কানের যিনা, হাত দিয়ে স্পর্শ করা হাতের যিনা, কোনো অবৈধ উদ্দেশ্যে পথ চলা পায়ের যিনা, এভাবে ব্যভিচারের যাবতীয় ভূমিকা যখন পুরোপুরি পালিত হয়, তখন লজ্জাস্থান তার পূর্ণতা দান করে অথবা পূর্ণতা দান থেকে বিরত থাকে' (মুসলিম, বাবু কাদরি আলা ইবনি আদাম হাযযাহু মিনায যিনা ওয়া গাইরিহ)।

এবার আমাদের চিন্তার বিষয় কতভাবেই না আমাদের মুসলিম সমাজ যিনাতে লিপ্ত। অশ্লীলতার কথা না হয় বাদই দিলাম। বস্তুত এসব অশ্লীল কার্যকলাপের ফলে উঠতি তরুণ-যুবকদের চরিত্র ঠিক রাখাই দায়। আমাদের সমাজে এসব প্রভাবকের আগমন খুব বেশি দিন নয়। একবিংশ শতাব্দীতেই এটি বেশি বিস্তার লাভ করছে। এর খারাপ প্রভাবও পড়ছে আমাদের সমাজে। আমরা বেশি নয়, মাত্র ৩০ বছর আগের সমাজের সাথে বর্তমান সমাজের তুলনামূলক আলোচনা করলেই স্পষ্টতই এসব অশ্লীলতার প্রভাব বুঝতে পারব। এজন্য আমাদের সমাজবিজ্ঞানী হওয়ারও দরকার নেই। শুধু দরকার একটুখানি বিবেক-বিবেচনা।

অশ্লীলতা বিস্তার ব্যভিচার ও ধর্ষণের প্রধান কারণ। এটি তৃতীয় শ্রেণির মানুষকে যেমন পশুর ন্যায় উত্তেজিত করে রাখে, তেমনই দ্বিতীয় শ্রেণিকেও যিনা-ব্যভিচারের সুযোগ সৃষ্টি করতে প্ররোচিত করে। এমনকি এটি প্রথম শ্রেণির মানুষকেও দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষে পরিণত করে। সুতরাং অশ্লীলতার সুযোগ বন্ধ না করে অন্য যেসব পন্থাই নেওয়া হোক না কেন, তা কাজে আসবে না।

পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ

যিনা ব্যভিচারের অন্যতম জঘন্যতম মাধ্যম পতিতাবৃত্তি বা দেহ ব্যবসা। ইসলাম এটিও হারাম করেছে। এমনকি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন 'তোমরা তোমাদের অধীনস্তদের অবৈধ বৃত্তিতে (দেহ ব্যবসায়) বাধ্য করো না' (সূরা নূর-৩৩)। হাদীসে এসেছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপার্জন হলো- ব্যভিচারিণীর ঐ উপার্জন যা সে ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্জন করেছে। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে রাফে ইবন খাদিজ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কুকুরের ব্যবসা নিকৃষ্ট এবং যিনাকারিণীর উপার্জনও নিকৃষ্ট"।(মুসলিম, বাবু তাহরীমি ছামানিল কালব)

পতিতাবৃত্তি তৃতীয় শ্রেণির মানুষ তো বটেই, দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষের জন্যও অশ্লীলতার দ্বার খুলে দেয়। সুতরাং এটি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে বন্ধ করতে হবে। হ্যাঁ এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন জাগে, এমতাবস্থায় মানুষ কীভাবে তার দৈহিক চাহিদা পূরণ করবে? ইসলাম এরও সুন্দর সমাধান দিয়েছে- বিবাহ অপারগতায় রোযা রাখা।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা 'আইয়িম' বিপত্নীক বা বিধবা মহিলা তাদের বিবাহ সম্পাদন করো এবং তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব দূর করে দিবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ (সূরা নূর-৩২)। পরের আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, "যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে" (সূরা নূর-৩৩)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হে যুবকের দল তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে সে যেন বিয়ে করে। বিয়ে হলো- দৃষ্টিকে নিম্নমুখীকারী এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষাকারী। আর যে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে না, সে যেন সিয়াম পালন করে। এটাই তার জন্য আত্মরক্ষাকারী।" (মুসলিম, বাবু ইসতিহবাবিন নিকাহ লিমান তাকাত নাফসুহু ইলাইহ...)

অথচ আমাদের সমাজে বিবাহের পথরুদ্ধ করে পতিতাবৃত্তির পথ খুলে দিয়ে যিনা-ব্যাভিচার বন্ধের চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা অনেকটা সে-ই অঙ্কের ন্যায় যে ট্যাঙ্কে দুটি ছিদ্র রেখে পানি ঢালা হচ্ছে। কোনোদিনই যা পূরণ হওয়ার নয়। বরং কতক্ষণে তা খালি হবে সে হিসেব মিলাতেই আমরা ব্যস্ত। বিবাহের পথ বন্ধ রেখে বা কঠিন করে দিয়ে যিনা-ব্যাভিচার হ্রাস করার প্রয়াস এমনই। হ্যাঁ, আমি এটা বলছি না যে, বিবাহ প্রথা সহজ করে দিলেই যিনা লুপ্ত হয়ে যাবে। কেননা বিবাহ শুধু সমাধানের একটি অংশ মাত্র। তাতে যিনা-ব্যভিচার কমবে, সেটা বলা যায় নিঃসন্দেহে।

পর্দা ফরয

যিনা ব্যভিচার প্রতিরোধে ইসলামের সর্বোত্তম নির্দেশনা হচ্ছে পর্দা প্রথার প্রচলন। এর দ্বারা সকল শ্রেণির মানুষই উপকৃত হতে পারে। আমাদের সমাজে একটি ভুল ধারণা আছে যে, শুধু নারীদেরই পর্দা রক্ষা করা ফরয। অথচ এটা সর্বোতভাবেই ভুল। শুধু নারী নয়, পর্দার হুকুম সকলের জন্যই। পর্দা প্রথার ব্যাপকতা অনেক, যেমন-

ক. নর-নারী উভয়ের জন্যই পর্দা ফরয।

খ. প্রকাশ্যে-গোপনেও পর্দা ফরয। একাকী থাকাবস্থায়, যখন কেউ জানবে না শুনবে না সে অবস্থাতেও পর্দা করা ফরয।

গ. সরাসরি ও মাধ্যমযোগেও পর্দা ফরয। অর্থাৎ সরাসরি দেখা সাক্ষাত যেমন হারাম তেমনই কোন মাধ্যমে গায়রে মাহরামকে দেখা হারাম। কেননা সরাসরি যা হারাম তা টিভি, মিডিয়া, ফেইসবুক, বই-খাতা সবকিছুতেই দেখা হারাম।

এ প্রেক্ষিতে সর্বোত্তম হচ্ছে নর-নারী উভয়েরই দৃষ্টি অবনত রাখা (সূরা নূর-৩০-৩১)। আর নারীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতাস্বরূপ সৌন্দর্য প্রকাশ না করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বোরকা পরিধান করেও যদি সৌন্দর্য প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয় তবে তাও পর্দার খিলাফ।

ইসলামের এই একটি বিধান যদি সর্বোতভাবে পালন করা যায়, তবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যিনা-ব্যভিচার তো দূরের কথা, এর সামান্যতম কোনো লক্ষণও সমাজে আর বাকী থাকবে না।

৪. পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ

প্রভাবক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ইসলাম নিজেদের পরিবেশকে সুন্দর ও সুস্থ রাখার নির্দেশনাও প্রদান করেছে। যেন মানুষ নিজেদের অবস্থা ও স্তর উন্নত করতে পারে। তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ ক্রমান্বয়ে প্রথম স্তরে উপনীত হতে পারে। এটাও অনেকটা প্রণোদনার মতোই কাজ করে। এ লক্ষ্যে ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে-

-তাকওয়া অর্জন।
-লজ্জাবোধের অনুশীলন।
-ধর্মীয় ও সামাজিক মূলবোধের সংরক্ষণ।
-সৎসঙ্গী ও বন্ধু নির্বাচন।
-বান্দার হক সম্পর্কে সচেতন হওয়া ইত্যাদি। [এরকম আরো বেশ কিছু নির্দেশনা আছে যা দ্বারা একজন মানুষ তার পরিবেশ ঠিক রাখতে পারে। এর প্রতিটি বিষয় নিয়েই পৃথক গ্রন্থ রচনা সম্ভব। কলেবরের সীমাবদ্ধতায় উপরে শুধু কয়েকটি পন্থা উল্লেখ করলাম মাত্র।]

৫. যিনার প্রতিষেধক

যিনার শাস্তি

হ্যাঁ, এরপরও যদি কেউ যিনায় লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে এর প্রতিষেধক হচ্ছে আইনের প্রয়োগ ও শাস্তি দান। যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনা করে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ, তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে' (সূরা নূর-২)। আর হাদীসে এসেছে, 'অবিবাহিত পুরুষ-নারীর ক্ষেত্রে শাস্তি একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর। আর বিবাহিত পুরুষ-নারীর ক্ষেত্রে একশত বেত্রাঘাত ও রজম (পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড)' (মুসলিম, বাবু রাজমিল ইয়াহুদী আহলিয যিম্মাতি ফিয যিনা)।

এসব দলীলের আলোকে শরীআ আইন অনুযায়ী, বিবাহিত যিনাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আর অবিবাহিত ব্যভিচারী নর বা নারীর শাস্তি দুটো-

১. একশত বেত্রাঘাত
২. এক বছরের জন্য দেশান্তর (যদিও হানাফী মাযহাবে এটি বিচারকের এখতিয়ারভুক্ত)।

এ শাস্তি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত- প্রথমত, ব্যক্তিগত পর্যায়ে শাস্তি প্রদান; দ্বিতীয়ত, সামাজিকভাবে অপরাধীর অবস্থানকে চিহ্নিত করা। এজন্যই যিনার শাস্তি প্রদানে দুটি শর্তারোপ করা হয়েছে-

১। কোনোরূপ দয়া দেখানো যাবে না। অর্থাৎ ক্ষমা করা যাবে না, বেত্রাঘাত একশতের কম করা যাবে না, কিংবা কোনোরূপ কৌশলের আশ্রয় নিয়ে আঘাতের মাত্রা লঘু করা যাবে না। যেমন- একশত বেত একসাথে বেধে নিয়ে একটি আঘাত করা, কিংবা আস্তে আস্তে আঘাত করা ইত্যাদি।

২। তা জনসমক্ষে প্রচারিত হতে হবে। যাতে করে ভবিষ্যতে আর কেউ এর সাহস না করে।

বলতে পারেন, অবিবাহিতের জন্য মাত্র ১০০ বেত্রাঘাত, এ আর এমন কি? কিন্তু সামাজিকভাবে প্রচার তার জীবনকে কি পরিমাণ দুর্বিষহ করে তুলবে সে শাস্তির পরিমাপ করা কি সম্ভব? প্রিয় পাঠক, নিজেকে একবার শাস্তি প্রাপ্ত হিসেবে কল্পনা করে দেখুন। সমাজের সবাই জানবে আপনি যিনার কারণে শাস্তি পেয়েছেন। এই লজ্জার চাইতে মরে যাওয়াই আপনার কাছে ভালো মনে হবে, যদি ন্যূনতম লজ্জা আপনার থাকে। তাছাড়া প্রয়োজনে দেশ থেকে নির্বাসনের শাস্তিও হাদীসে আছে। আরো মজার ব্যাপার হলো, হুদুদের এই আইনে ক্ষমার কোনো বিধান নেই। রাষ্ট্রপতি তো কোনো ছাড়, কাবার ইমামেরও এই এখতিয়ার নেই যে এ শাস্তি রহিত করে। শাস্তি হবেই এবং তা জনসমক্ষে।

ইসলামে নারী-পুরুষের যেকোনো বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক মিলনই যিনা হিসেবে চিহ্নিত। চাই তা সম্মতিতে হোক বা বিনা সম্মতিতে হোক। আর এ যিনা দণ্ডনীয় অপরাধ। ইসলামী দণ্ডবিধির হুদুদ শাস্তির আওতাধীন। যা কোনভাবেই বাতিলযোগ্য নয়। তবে তা প্রমাণের জন্য ইসলামে চারজন পুরুষ চাক্ষুষ সাক্ষীর বিধানসহ বেশ কিছু কঠোর প্রক্রিয়া অনুসরণের শিক্ষা ও নির্দেশনা দেওয়া আছে। অবশ্য যিনাকারীর স্বীকারোক্তি অথবা সাক্ষ্য না পাওয়া গেলে আধুনিক ডিএনএ টেস্ট, সিসি ক্যামেরা, মোবাইল ভিডিও ইত্যাদি অনুযায়ীও ধর্ষককে দ্রুত গ্রেফতার করে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। তাতে স্বীকারোক্তি পাওয়া গেলে হুদুদ শাস্তি কার্যকর করা যাবে। অন্যথায় তাযীরের আওতায় শাস্তি দেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে, ইসলামী দণ্ডবিধিতে অনেক সময় তাযীরের শাস্তি হুদুদের চাইতেও বেশি কঠিন হতে পারে।

ধর্ষণের শাস্তি

ইসলামের পরিপূর্ণতার আরো একটি উদাহরণ হচ্ছে, ইসলাম ধর্ষণের ক্ষেত্রেও যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলামী আইনে ধর্ষণের শাস্তি যিনার শাস্তির চাইতেও মারাত্মক। কেননা ধর্ষণের ক্ষেত্রে দুটো বিষয় সংঘটিত হয়।

১. যিনা ব্যভিচার
২. বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন।

প্রথমটির জন্য ধর্ষক সকল ইমামদের ঐকমত্যে পূর্বোক্ত ব্যভিচারের শাস্তি পাবে। পরেরটির জন্য ইসলামী আইনজ্ঞদের একদলের মতে, ধর্ষককে মুহারাবার শাস্তি দেওয়া হবে। মুহারাবার শাস্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হলো- তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি' (সূরা মায়িদা-৩৩)। অর্থাৎ তাদের শাস্তি হলো-

-তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা
-শূলে চড়ানো হবে অথবা
-তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে (ডান হাত বাম পা/বাম হাত ডান পা) কেটে দেওয়া হবে অথবা
-দেশ থেকে বহিষ্কার তথা নির্বাসিত করা হবে।

আর সর্বাবস্থাতেই ধর্ষিতার কোনোরূপ শাস্তি হবে না। বরং সম্মানজনকভাবে তাকে নির্দোষ ঘোষণা করা হবে।

প্রিয় পাঠক, একবার নিজেকেই প্রশ্ন করুন, উপরের শাস্তি যদি কার্যকর করা যায়, তাহলে কি বাংলাদেশে ধর্ষণ বলে কিছু থাকবে? কার এমন বুকের সাহস যে, এরপরও ধর্ষণে এগিয়ে যাবে?

ধর্ষিতার পুনর্বাসন

ধর্ষকের শাস্তির পাশাপাশি ধর্ষিতার পুনর্বাসনের কথাও ইসলাম ভুলে যায়নি। বর্তমানে আমাদের সমাজে বিবেকবান কিছু মানুষ ধর্ষিতার ছবি বা পরিচয় প্রকাশ না করার কথা বলছেন। নিঃসন্দেহে তা ভালো উদ্যোগ। কেননা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ষিতাকে খারাপই মনে করা হয়। সে হিসেবে তাদের পরিচয় প্রকাশ হলে তা তাদের ভবিষ্যত জীবনের জন্য চরম দুর্ভোগ ডেকে আনতে পারে। অথচ ইসলামের পুনর্বাসন ব্যবস্থা আরো উন্নত ছিল। আর তাও এমন সমাজে, যেখানে ধর্ষিতাকে খারাপ চোখে দেখা হতো না; বরং অবস্থার শিকার হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। তারপরও ইসলাম তাদের ব্যাপারে খুবই উন্নত মানবিকতার নির্দেশনা প্রদান করেছে। যেমন,

-ধর্ষিতাকে সসম্মানে নির্দোষ ঘোষণা করা

-ধর্ষক কর্তৃক তাঁকে মোহর পরিমাণ টাকা জরিমানা প্রদান।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের ভুলবশত করা অপরাধ, ভুলে যাওয়া কাজ এবং বলপ্রয়োগকৃত বিষয় ক্ষমা করে দিয়েছেন (সহীহ ইবনু হিব্বান, বাবু যিকরিল আখবারি আম্মা ওয়াদাল্লাহু বিফাদ্বলিহি আন হাযিহিল উম্মাহ)। এ মূলনীতির আলোকে শরীআর বক্তব্য হলো ধর্ষণের ক্ষেত্রে ধর্ষিতার কোনো গুনাহ হয় না। সুতরাং তাকে যারা কটূক্তি করবে তারাই অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে।

এভাবে শাস্তির ব্যবস্থা ও প্রয়োগের কঠোরতার মাধ্যমে ইসলাম সমাজ থেকে যিনা ব্যভিচারের মূলোৎপাটন করেছে। এজন্য দেখা যায়, জাহিলিয়াতের সবচেয়ে নিকটবর্তী সময় হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের প্রথম যুগে দুএকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া, কোনো ব্যভিচার ছিল না। অথচ ইসলাম পূর্ব যুগটাই ছিল যিনা-ব্যভিচারের যুগ। কোন যাদুতে সে মানুষগুলো যিনা-ব্যভিচার ভুলে সুন্দর আচরণের উপমা হয়ে রইলেন? প্রিয় পাঠক, ভাবুন, চিন্তা করুন।

এটা মূলত ইসলামেরই সুমহান আদর্শের ফল। যদি নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করা হয়, তাহলে সম্ভবত সবাই ইসলামের এই বিধানের উপকারিতা বুঝতে পারবেন। ইসলাম শুধু যিনা বা ধর্ষণের মানসিকতাপূর্ণ দুর্বল মানুষেরই চিকিৎসা করেনি; বরং সকল শ্রেণির মানুষকেই সমান গুরুত্বারোপ করেছে। কেননা যেহেতু এটি সামাজিক সমস্যা সেহেতু সমাজের কোনো একটা অংশকে বাদ দিয়ে এর সমাধান কীভাবে সম্ভব? পাশাপাশি ইসলাম শুধু একজন যিনাকারী বা ধর্ষককে শাস্তি দিয়েই এ সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব শেষ মনে করেনি। বরং যিনা-ধর্ষণের কারণ ও এর পেছনের প্রভাবক উপাদানগুলোর প্রতিও সমভাবে দৃষ্টি দিয়েছে। আর এরূপ সর্বাত্মক প্রয়াসের ফলেই শুধু যিনা বা ধর্ষণ পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব।

আফসোস হলো, প্রায় ১৪৫০ বছর পূর্বে যেখানে এত সর্বাত্মক বিধান দেওয়া হলো, সেখানে আমাদের উত্তরাধুনিক গবেষকগণ কারণ, উপাদান সবকিছুকে একপাল্লায় মেপে যৌন হয়রানি বন্ধের পরিকল্পনা করেন। এটা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, ডুবন্ত জাহাজকে বাঁচাতে হলে এর সব ফুটোই বন্ধ করতে হয়। একটি ফুটোও যদি বাকী থাকে, তাহলেও জাহাজ বাঁচানো সম্ভব না। হয়ত একটু দেরি করানো যাবে, কিন্তু আজ না হয় কাল জাহাজ ডুববেই।

আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ আজ এ পথেই যাচ্ছে। শুধু আইন আর এর প্রয়োগ নিয়ে মেতে থাকলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। এজন্য চাই সমন্বিত পরিকল্পনা, সর্বাত্মক বিধান। ইসলাম একটি মডেল অনেক আগেই দিয়ে গেছে। আমাদের কর্তৃপক্ষ চাইলে তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন। আর যদি মনে করেন, এটা ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে কাজ হবে, তাও চেষ্টা করে দেখেন। কিন্তু যা-ই করেন তা যেন সমন্বিত হয়। কেবল এক দুইটা ফুটো বন্ধ করার মতো যেন না হয়। এরূপ হলে তাতে কাজ হবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

আমি বুঝতে পারি না, ব্যভিচার বা ধর্ষণ নির্মূলই যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তবে কেন ইসলামের এই সার্বিক বিধান অনুসরণ করা হচ্ছে না। অন্য অনেক কিছুই তো করা হলো; তাতে কতটুকু কাজ হয়েছে তাও স্পষ্ট। এবার কেন তাহলে ইসলামের দিকে ফিরে আসা নয়? এর একটাই কারণ হতে পারে, সম্ভবত আমরা নিজেরাই এর নির্মূল চাই না। যদি এমনই হয়, তবে কেনই বা লোক দেখানো সমাধান প্রচেষ্টা?

যাই হোক, আমাদের প্রিয় দেশে আমরা আর কোনো ধর্ষণ দেখতে চাই না, চাই না কোনো বোনের আহাজারি শুনতে। অপেক্ষায় থাকলাম আমরা; কেউ যেন (কোনো ধর্ষক বা সরকার) বলতে না পারে আমরা তাদের জানাইনি, সতর্ক করিনি। হয়তো একদিন সকলেই আমরা ইসলামের দিকে ফিরে আসব। আমাদের গন্তব্য তো হে রব, তোমারই পানে।

ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ।

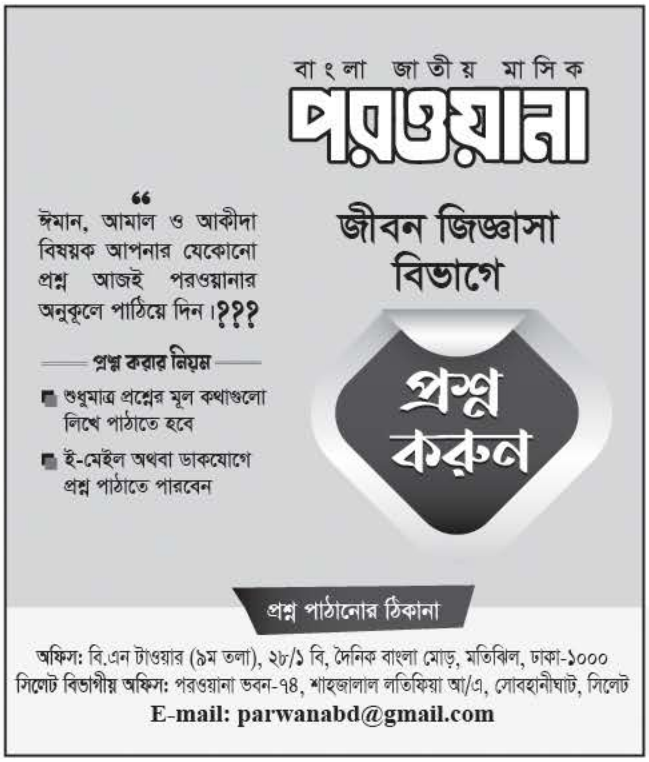

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর ভালোবাসা

মোহাম্মদ খছরুজ্জামান

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) নবী রাসূলের পর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে রাসূলের প্রতি অগাধ ভালোবাসা আর গভীর আস্থা। তাঁর জীবন ছিল নবীপ্রেমে পরিপূর্ণ নিমজ্জিত, তিনি রাসূলের প্রেম সাগরে চির সাতারু, হুব্বে রাসূলে বিদগ্ধ আত্মার অধিকারী, নবীর ধ্যানে মগ্ন বিভোর সাধক। তাঁর মতো রাসূল প্রেমিক পৃথিবীতে দ্বিতীয় আরেকজন নেই। তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ রাসূলের প্রতি ভালোবাসায় ভরপুর।

রাসূলের প্রতি আবূ বকর (রা.) এর সীমাহীন ভালোবাসা বৃথা যায়নি দুনিয়া ও আখিরাতে। তিনি রাসূলের তিন বছরের ছোট ছিলেন। তাই বন্ধুত্ব ছিল বাল্যকালের। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, চাঁদ নেমে আসল মক্কায়। চাঁদের কিরণে আলোকিত সব ঘর। সমুদয় আলো এসে জমা হলো তাঁর কোলে। জাহিলী যুগেও তিনি জ্ঞানী লোক। চাঁদ এবং আলো দেখে দারুণ ভাবিত। খোঁজতে লাগলেন তা'বীর। খিষ্টান যাজকের ভাষ্য, 'আপনি নবীর অনুসারী হবেন। ফলে পরিণত হবেন শ্রেষ্ঠ মানুষে।' নবীর সাথে সম্পর্কের সুযোগ হয়েছিল নুবুওয়াত প্রকাশের পূর্বেই। ঈমান আর সখ্যতার শুরু তখন থেকে। সঙ্গ দিতেন সার্বক্ষণিক। আয়িশা (রা.) বলেন, আমার বাবা সারাক্ষণ হুযূরের খিদমতে থাকতেন। রাতে মাত্র কটি ঘণ্টা ঘরে কাটানো ছিল অতি কষ্টের। বিরহ বিচ্ছেদে সময় পার হতো না। অন্তরে নবীপ্রেম জ্বলত দাউদাউ করে। নিভৃত হতেন পরবর্তী দর্শনে।

তিনি রাসূলের সকল সময়ের সহযাত্রী ছিলেন। ফলে সহ্য করতে হয়েছে নিষ্ঠুর নির্যাতন। তিনি মক্কার প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়েও নবীপ্রেমিক হওয়াতে কাফির মুশরিকদের হিংস্র থাবায় জর্জরিত হন। নবীর প্রতি ভালোবাসার অপরাধে নির্যাতনের শিকার হন। কিন্তু টলাতে পারেনি কোনো ঝড়-তুফান। কাফির মুশরিকদের আঘাতে রক্তাক্ত সমস্ত শরীর। তাকে চেনা দায়। তিনি আর বেঁচে আছেন কিনা সন্দেহ। এরপরও হুঁশ এলে চোখ খুলেই প্রথম কথা বলেন, নবীর অবস্থা কী? হুব্বে রাসূলের এ এক অনুপম দৃষ্টান্ত।

আবূ বকর রাসূলের চিরসঙ্গী। হিজরতেও সঙ্গী হবেন। ইঙ্গিত পান আগে থেকেই। তাই সদা সতর্ক অবস্থানে। গভীর রাতে রাসূল বেরিয়ে এলেন। সবদিকে শত্রু, দরজায় করাঘাত মাত্রই সঙ্গী প্রস্তুত। এ প্রস্তুতি দীর্ঘ দিনের। নবীর সন্তুষ্টিতে সর্বাত্মক সতর্কতা। অন্ধকার রজনী, দুর্গম পথ, চতুর্দিকে দুশমনের তল্লাশী। বন্ধুযুগল হলেন মদীনামুখী। গারে সওরে আত্মগোপন করলেন। প্রাণনাশের আশঙ্কা চরম। ভয় ভীতি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মনোবল তখনও বলিষ্ঠ। কুরআনে এসেছে দৃঢ়তার ইঙ্গিত; "তিনি তাঁর সাথীকে বলেন, ভয় করো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে।" চরম সংকটে অভয় বাণী। নবীর সাথে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের উজ্জ্বল উপমা, নবীর প্রতি ভালোবাসা- এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর নেই; নিজের জীবনও না, জ্বলন্ত প্রমাণ দিলেন প্রথম খলীফা। সওর পর্বতের গুহায় সর্পের দংশন। বিষের অসহ্য যন্ত্রণায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। নবীর ভালোবাসায় নিজের জীবন বিসর্জন দিবেন তবু নবীর ঘুমে ব্যাঘাত করা যাবে না। তিনি বুঝলেন রাসূলের সন্তুষ্টিই ইসলাম।

তাবুক যুদ্ধ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় পরিচালিত একটি উল্লেখযোগ্য সমর অভিযান। নবীর ডাকে বসল পরামর্শ সভা। ডাক পড়ল আর্থিক সহযোগিতার। সাধ্যানুযায়ী সকলে অংশগ্রহণ করলেন। প্রতিযোগিতামূলক অংশগ্রহণ। শীর্ষে রইলেন তিন খলীফা। আবূ বকর (রা.) হাজির করলেন তাঁর সর্বস্ব। রাসূলের জিজ্ঞাসা, ঘরে কী রেখে এসেছ? ঘরে রেখে এসেছি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল। ইশকের দরিয়ায় ডুবন্ত আপাদমস্তক। রাসূলের সন্তুষ্টিই আসল বিষয়। ভালোবাসায় অপূর্ব আত্মসমর্পণ। সব সম্পদ বিলিয়ে দিলেন ভালোবাসার বলে।

মিরাজের ঘটনা সাধারণ বিচারে অবিশ্বাস্য। যেমনটা অবিশ্বাস করেছে কাফির সম্প্রদায়। জ্ঞান গরীমায় তাদের কমতি ছিল না। কমতি ছিল বিশ্বাসে আস্থায়। তারা মনে করত তিনি আরো দশজনের মতো সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ অক্ষম। অলৌকিক কর্ম সম্পাদনে নবীর অলৌকিক কর্ম তাদের বিশ্বাসের বাইরে। নবীকে দেখল সরাসরি অথচ রইল কাফির। কারণ একটাই। দেখেনি ভালোবাসার চোখে, আস্থার আয়নায়। মিরাজের সংবাদ শোনামাত্র বিশ্বাস করে সিদ্দীক উপাধি লাভ করেন হযরত আবূ বকর। অসম্ভব সম্ভব হলো আবূ বকরের পক্ষে। কাফির মুশরিকও জানত তিনি নবীপ্রেমিক। প্রেমের বন্ধনে ব্যাঘাত ঘটাতে মিরাজের ঘটনা বলে দিয়ে নড়ানোর চেষ্টা করেছে- ব্যর্থ চেষ্টা। কিন্তু তিনি বিশ্বাসে অটল-অনঢ়। সত্যিই যদি নবী বলেন, তিনি মিরাজে গমন করেছেন তবে আমি বিশ্বাস করলাম। এই বিশ্বাস ভালোবাসার বিশ্বাস। গভীর আস্থা আর বলিষ্ঠ ভালোবাসার বলে তিনি পরিণত হলেন সিদ্দীকে আকবরে।

হযরত আবূ বকর (রা.) বার্ধক্যে উপনীত। মৃত্যুর আগে কতিপয় ওসিয়ত করলেন। জানাযার পর আমার সালাম পৌঁছাবে রওদ্বায়ে আতহারে। রওদ্বার পাশে দাফনের অনুমতি চাইবে। ওসিয়ত মতো হুবহু তাই করা হলো। রওদ্বা থেকে আওয়াজ আসল- 'বন্ধুকে বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও'। তাঁকে কবরস্থ করা হলো রওদ্বায়ে আতহারের পাশে। মৃত্যুর পরও বেছে নিলেন বন্ধুর সান্নিধ্য। এ এক অপূর্ব ভালোবাসা। যার ইতি নেই, মরণের পরও তা জীবন্ত।

হযরত আবূ বকর (রা.) ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিবেদিত এক বিশাল বিস্তৃত জীবন। অসীম অবদানে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলে স্বীকৃত। তাঁর জীবন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নবীপ্রেমে ভরপুর। তাঁর পুরো জীবন নবী প্রেমের উজ্জ্বল উপমা। নবীর প্রতি উম্মতের সম্পর্কের ধরণ– আকীদা-বিশ্বাস, ভাব-ভক্তি, ধ্যান-ধারণা, প্রেম-ভালোবাসা, অনুসরণ-অনুকরণ কেমন হওয়া আবশ্যক অনায়াসে সব শিখিয়ে দিবে তাঁর জীবন। সাহাবায়ে কিরাম ইসলাম বুঝেছেন সরাসরি নবী থেকে। এমন সৌভাগ্য আর কারো হয়নি। ঈমানে-আমলে, ইলমে-আখলাকে তাঁরাই সেরা। আর আবূ বকর (রা.) সেরাদের সেরা। কোন আমলে আল্লাহ খুশি হন, দুনিয়া আখিরাত কামিয়াব হয়, জান্নাত লাভ করা যায়, হযরত আবূ বকরের চেয়ে অধিক সমঝদার আর নেই। তিনি ইসলামের যাবতীয় আমল পালনের পাশাপাশি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন রাসূলের মহব্বতে। তাই আবূ বকর (রা.) সহ সাহাবা অনুসারী দাবি করলে হুব্বে রাসূল বুকে ধারণ ও লালন অপরিহার্য।

দেশে দেশে ভাষার লড়াই

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

ভাষার জন্য আত্মদানকারী প্রথম জাতি বাঙালি। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাতৃভাষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা। সেই স্মৃতি নিয়ে প্রতি বছর আসে গৌরবোজ্জ্বল একুশে ফেব্রুয়ারি। একুশের পথ পরিক্রমায়ই প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশ, বাংলাদেশ। ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা লাভ করেছে। সুতরাং বাংলাদেশসহ বিশ্ববাসীর জন্য এ দিনের গুরুত্ব অপরিসীম।

ভাষার লড়াই হয়েছে যুগে যুগে দেশে দেশে। ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজে হিন্দিকে শিক্ষার ভাষা হিসেবে চালু করতে আইনসভায় আইন পাশ করার চেষ্টা করে আচারিয়া সরকার। মাদ্রাজের অধিবাসীর ৭০ শতাংশ তামিলভাষী এর বিরোধিতা শুরু করে। শুরু হয় উপমহাদেশের প্রথম ভাষা আন্দোলন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার নারী-পুরুষ কারাবরণ করেন।

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা 'উর্দু' হওয়ার ঘোষণা আসে। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবিতে শুরু হয় আন্দোলন। ১৯৫২ সালে আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান রফিক, সালাম, বরকত, আব্দুল জব্বার। আহত হন আরো ১৭ জন। ভাষার জন্য আত্মদানের এই সূচনা। পরদিনে আবার হয় প্রতিবাদ মিছিল। গুলিতে প্রাণ হারান শফিউর রহমান, আউয়াল ও এক কিশোর। এই আত্মদানের ফলে ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

১৯৬০ সালে ভারতের আসাম প্রদেশে কংগ্রেস সরকার অসমিয়াকে প্রদেশের একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। এখানে বরাক উপত্যকার বাংলাভাষীরা প্রতিবাদে নামেন। ১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে মিছিলে গুলি চালায় পুলিশ। ঘটনাস্থলে মারা যান ৯ জন। দুজন পরে মারা যান। মারা যান কমলা ভট্টাচার্য নামীয় এক ছাত্রী। যিনি ভাষা আন্দোলনের প্রথম নারী শহীদ। এ ঘটনায় আসাম সরকার বাংলাকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

এদিকে ভারতের সংবিধান কার্যকর হলে হিন্দি প্রধান হিসেবে গৃহীত হলে আবারো মাদ্রাজে হিন্দি বিরোধী আন্দোলন চাঙ্গা হয়। ১৯৫৮ সালে তামিলদের উদ্দেশ্যে নেহেরুর তির্যক মন্তব্যে রক্তক্ষয়ী প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে ৩০০ মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়। ১৯৬৫ সালের ২৬ জানুয়ারি সংবিধান কার্যকর হওয়ার আগের দিন দুজন স্কুলছাত্র শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহুতি দেন। শুরু হয় হিন্দি বিরোধী তুমুল আন্দোলন। ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এক সপ্তাহে ভাষার জন্য ১৫০ জন তামিলভাষী মানুষ নিহত হন।

একই আন্দোলনে ১৯৯৩ সালে ১৫ হাজার নেতাকর্মী গ্রেফতার হন। ভাষা সংগ্রামের ইতিহাসে এত দীর্ঘ সক্রিয় আন্দোলন দ্বিতীয়টি আর নেই। অবশেষে ২০০৪ সালে রাষ্ট্রপতি এপিজে আবুল কালাম ইতিহাসের প্রথম তামিলকে ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

বঙ্গভঙ্গ রদের পর বাংলাভাষী অধ্যুষিত মানভূম ভোলোকে বিহার-উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হয়। দেশ বিভাগের পর বিহারে প্রশাসনিক ভাষা হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলে আবার আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫১ সালে সত্যাগ্রহ এবং ১৯৫৪ সালে এটা টুসু আন্দোলন নাম ধারণ করে। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এ আন্দোলনে ৯৬৫ জন কারাবরণ করেন। অবশেষে ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর পুরুলিয়াকে পশ্চিমবঙ্গের জেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কেবল যে বাংলা ভাষার জন্য মানুষ প্রাণ দিয়েছে তা নয়, বাংলা ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদেও আন্দোলন হয়েছে। ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের সব স্কুলে বাংলা শেখানো বাধ্যতামূলক করে। এর প্রতিবাদে ফেটে পড়ে দার্জিলিং এর সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালি ভাষী গোর্খা জনগণ। এ ঘটনায় বহু মানুষ হতাহত হন। দার্জিলিংকে পৃথক গোর্খাল্যান্ড ঘোষণার দাবি আবার সরব হয়ে ওঠে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় জুলু ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৯৭৬ সালে হয় তুমুল আন্দোলন। ১৯৭৬ সালের ১৬ জুন ভাষার দাবিতে সোয়াটা শহরে ৭০০ জন স্কুল ছাত্র প্রাণ হারান। সরকারি হিসেবে যা ১৭৬। যার ফলে আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। ১৬ জুন বিশ্বের ভাষা আন্দোলনে সর্বাধিক রক্তাক্ত দিন।

চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে কাজাখ ভাষী উইঘুর মুসলমানদের ওপর চলছে নিষ্ঠুর নির্যাতন। ২০১৬ সালে চীনে খোলা হয় বিশেষ বন্দি শিবির। সেখানে ২০ লাখ উইঘুরকে বন্দি রাখা হয়। তাদেরকে মান্দারিন ভাষা শিক্ষার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। চলছে শারীরিক নির্যাতন। হাতের আঙ্গুলে সূচ প্রবেশ করানোর মতো নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ড চলছে। রাষ্ট্রীয় আয়োজনে জিনজিয়াংয়ে ১ কোটি ২৬ লাখ মানুষকে নির্যাতন করা হচ্ছে। যা এখন অব্যাহত রয়েছে।

রোহিঙ্গা নির্যাতনের মূলে রয়েছে ভাষার সূতা। মায়ানমারের রাখাইনের অধিবাসীদের ভাষা রোয়াইঙ্গা। এ ভাষার নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। সম্পূর্ণ কথ্য ভাষা। বাংলা ভাষা বা বর্ণের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। যদিও কক্সবাজারের আঞ্চলিক ভাষার সাথে কিছুটা মিল রয়েছে। যার ফলে বাঙালি হিসেবে অপবাদ আসে। মায়ানমারে ১৩৫ জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতি থাকলেও ১৯৮২ সালে রোহিঙ্গাদের স্বীকৃতি ও নাগরিকত্ব হরণ করা হয়। শুরু হয় নির্যাতন। বাকিটুকু উল্লেখ করাই বাহুল্য। যার ভুক্তভোগী আমরা।

১৯৫২ সালের আত্মদানে প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা বাংলা। ১৯৯৯ সালে ইউনেসকো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দান করে । ২০০০ সাল থেকে বিশ্বের ১৮৮ দেশে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হতে শুরু হয়। ২০১০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দিনটিকে স্বীকৃতি দান করে। ভাষা আন্দোলন যেমন আমাদের অহঙ্কার, এই স্বীকৃতিও তেমন গৌরবের। অনাগত বিশ্বের কোনো জাতি যেন তার মাতৃভাষার জন্য নিপীড়িত না হয়, এই প্রত্যাশা।

তালামীযে ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী : আমার অনুভূতি

মুহাম্মদ আব্দুন নূর

[১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। এ উপলক্ষ্যে সংগঠন প্রতিষ্ঠার ইতিহাসসহ কিছু অনুভূতি লিখে পাঠিয়েছেন সংগঠনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ'র সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাওলানা এম.এ নূর। অনুসন্ধানী লেখক ও পাঠকের জন্য এটি ইতিহাসের খোরাক যোগাবে।] -সম্পাদক

বিজাতীয় অপসংস্কৃতির সয়লাবে যখন আমাদের ছাত্র ও তরুণ সমাজ বিপথগামী হচ্ছিল, নাস্তিক, মুরতাদদের অপতৎপরতায় যখন সমাজ কলুষিত হচ্ছিল, ইসলামের নামে বাতিল আকীদার সাংগঠনিক কার্যক্রম যখন কোমলমতি ছাত্রসমাজকে বিভ্রান্ত করছিল, সর্বোপরি লেজুড়ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার বদলে যখন অস্ত্রের ঝনঝনানি চলছিল এমনি একটি ক্রান্তিকালে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ওলীয়ে কামিল শামসুল উলামা হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) ১৯৮০ সালে তাঁর বহুমুখী দ্বীনী খিদমাতের অংশ হিসেবে দাওয়াতী সফরে ইউরোপ যাওয়ার প্রাক্কালে একঝাঁক মেধাবী তরুণ ১২৩ মনেশ্বর রোড, জিগাতলা, ঢাকায় তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। দেশ ও জাতির ক্রান্তিকালে তিনি জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার ছাত্রসমাজকে তাদের করণীয় ও বর্জণীয় সম্পর্কে দীর্ঘ নির্দেশনা প্রদান করেন এবং আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলীর সাথে পরামর্শক্রমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাভিত্তিক একটি ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে আল্লামা ইমাদ উদ্দীন চৌধুরী ফুলতলীর নির্দেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র নেতৃবৃন্দের এক সভা ১৯৮০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ইছামতি আলিয়া মাদরাসায় শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল জব্বার গোটারগ্রামী (র.) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী'র দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য ও পরামর্শের ভিত্তিতে মাওলানা নূরুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে 'বাংলাদেশ সুন্নী ছাত্র পরিষদ' নামে একটি ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এ আহ্বায়ক কমিটির ফান্ড গঠনের জন্য হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ছাহেব তাঁর লিখিত প্রাথমিক তাজবীদের ২০০ কপি দান করেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদানুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল ﷺ প্রদর্শিত পথে ছাত্রসমাজের জীবন গঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রেখে লেখাপড়াকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা। আত্মিক, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে যেমন কাজ করতে হবে, তেমনিভাবে ইসলামের নামে বাতিল আকীদাপন্থী সংগঠনকে পরিহার করে খিলাফত আলা মিহাজিন নুবুওয়াত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। কোনো অবস্থাতে লেজুড়ভিত্তিক রাজনীতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে ছাত্রসমাজের ভবিষ্যত বিনষ্ট করা যাবে না। ঈমান, আমল ও আখলাকে হাসানার প্রতি যেমন গুরুত্বারোপ করতে হবে তেমনি খিদমাতে খালকের প্রতি থাকতে হবে নিরলস প্রচেষ্টা। এ সমস্ত কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রথম বছরেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠন ও সাংগঠনিক কার্যক্রম দুর্বার গতিতে এগিয়ে যায়। পরের বছর একই নামে বাংলাদেশের অন্য এলাকায় আরেকটি ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠার সংবাদে সিলেটের সবুজ বিপণীতে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও উপদেষ্টামণ্ডলির যৌথ সভায় নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া। মাওলানা ইসহাক আহমদকে সভাপতি ও মাওলানা আব্দুল জব্বারকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠন করে নূতন উদ্যোমে কাজ শুরু হয়।

> *কুখ্যাত দাউদ হায়দার, সালমান রুশদী, তাসলিমা নাসরীনসহ নাস্তিক মুরতাদরা যখনই মহানবী ﷺ এবং ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছে তখনই তালামীযে ইসলামিয়া আন্দোলনের মাধ্যমে মাঠে ময়দানে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে তা অনন্য।*

নতুন নামে নতুন প্রেরণায় স্বল্প দিনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপজেলা, জেলা ও মহানগর কমিটি গঠন করে সুস্থ ধারার ছাত্র সংগঠন পরিচালনা ও স্কুল, কলেজ, মাদরাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে বাংলাদেশের হক্কানী উলামায়ে কিরাম ও পীর-মাশায়িখ, যাদের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় তালামীযের কাজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যায়, শ্রদ্ধাভরে তাদের নাম স্মরণ করছি।

প্রধান উপদেষ্টা- আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.)

উপদেষ্টামণ্ডলি

আল্লামা নিজামুদ্দীন চৌধুরী, পীর ছাহেব বিশকুটি
আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী
শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান ছাহেব, রারাই
আল্লামা ইসহাক আহমদ শায়দা, বিশ্বনাথ
আল্লামা ফরীদুদ্দীন আত্তার, ঢাকা
আল্লামা রুহুল আমীন খান, ঢাকা
শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল জব্বার গোটারগ্রামী
আল্লামা আব্দুর রহমান ছাহেব, বর্ণী
আল্লামা জালাল সিদ্দিকী
আল্লামা আব্দুল খালিক, বুরাইয়া
আল্লামা আব্দুল কাইয়ুম সিদ্দিকী, মৌলভীবাজার
মাওলানা মুহিবুর রহমান (সাবেক অধ্যক্ষ হবিবপুর)
মাওলানা মহিউদ্দিন (সাবেক অধ্যক্ষ ভানুগাছ)
হাফিয নোমান আহমদ চৌধুরী, ইমামবাড়ি

আরো অনেকেই যাদের নাম এ মুহূর্তে স্মরণ হচ্ছে না। উপদেষ্টা ও ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা ইতিমধ্যে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন রাব্বুল আলামীন তাঁদের জান্নাতের উচ্চ মাকাম নসীব করুন এবং যারা জীবিত আছেন আল্লাহ তাদেরকে নেক হায়াত দান করুন। আমীন।

দেশ ও জাতির ক্রান্তিকালে বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার ভূমিকা ও যুগান্তকারী খিদমাতসমূহ সচেতন নাগরিক হিসেবে কারো অজানা নয়। কুখ্যাত দাউদ হায়দার, সালমান রুশদী, তাসলিমা নাসরীনসহ নাস্তিক মুরতাদরা যখনই মহানবী ﷺ এবং ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছে

তখনই তালামীযে ইসলামিয়া আন্দোলনের মাধ্যমে মাঠে ময়দানে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে তা অনন্য। বিশেষ করে ভারতের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে এবং মাদরাসা শিক্ষা সংকোচনের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতিকে এক কাতারে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। হযরত শাহজালাল মুজাররদে ইয়ামনী (র.) এর মাযারসহ ৬৪ জেলায় একসাথে বোমা হামলার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল সিলেট বিভাগ। ২০০১ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের নামকরণে সর্বদলীয় ছাত্র আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে ভূমিকা রেখেছে এ ছাত্র সংগঠনটি। এ আন্দোলনে কতিপয় তালামীয নেতৃবৃন্দ গুলিবিদ্ধ হন। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার আমাদের দাবি মানতে বাধ্য হন। ইরাকে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে ঢাকার রাজপথে এবং সিলেটে তালামীযের বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা ছিল সমকালীন সময়ের বৃহৎ আন্দোলন, যা বাংলাদেশ ছাড়াও বহির্বিশ্বের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়।

১৯৮৯ সালে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার আহ্বানে বাংলাদেশের সকল তরীকার পীর মাশায়িখ, আলিম-উলামা, বুদ্ধিজীবি ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর নির্দেশে তালামীযই পারে দেশের সকল অঞ্চলের পীর-মাশায়িখ ও আলিম উলামাকে এক কাতারে নিয়ে আসতে। তখন কয়েকদিন টক অব দ্যা কান্ট্রি ছিল যে, দেশের এত পীর-মাশায়িখ একসাথে ইতিপূর্বে দেখার সুযোগ হয়নি। যদিও এ সমাবেশের পূর্বে হোম ওয়ার্কে অনেক সময় লেগেছিল। তখন থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে অগ্রণী ভূমিকা রেখে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে তালামীযে ইসলামিয়া। বিশেষ করে সিডর, আইলা আক্রান্ত এলাকা ও রোহিঙ্গা পূনর্বাসনে শুধুমাত্র অন্ন, বস্ত্র দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি বরং তৈরি করে দিয়েছে মসজিদ ও ঘর এবং বিশুদ্ধ পানির জন্য টিউবওয়েল। আর্ত-মানবতার সেবায় বারবার যাতায়াত ও প্রচার বিমুখ খিদমাতের জন্য প্রশাসন ও সেনা বাহিনীর লোকজন তাদের প্রশংসা করেছে। অপরদিকে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে যুগপথ আন্দোলনে বলিষ্ট ভূমিকা রেখেছে তালামীযে ইসলামিয়া।

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কারো অজানা নয়। আল্লামা ছাহেব কিবলাহর নির্দেশে তালামীযের নেতৃত্বে লক্ষাধিক লোকের ঢাকামুখী লংমার্চের ফসল হলো আজকের ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ সংগঠনের নগণ্য কর্মী হিসেবে আমার মূল্যায়নে মানুষ গড়ার কারিগর এ সংগঠন অগণিত যোগ্য লোক তৈরি করেছে। যারা আজ দেশ-বিদেশে কর্মজীবনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করছেন। অধ্যক্ষ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, অধ্যাপক, ইমাম, প্রশাসক, ডাক্তার, সম্পাদক, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি ও ব্যবসায়ী ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে তাদের সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার স্বাক্ষর এগিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা এ সংগঠনকে কবূল করুন এবং এর কর্মীবৃন্দকে দ্বীনী খিদমাত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

LATIFI HANDS
CHARITY WITH CLARITY

LATIFI HANDS

FULTALI SAHEB BARI, ZAKIGANJ, SYLHET, BANGLADESH

OUR PROJECTS

EDUCATION
ORPHANS
HOUSING PROJECTS
MASJID PROJECTS
INFRASTRUCTURE
SUSTAINABLE LIVELIHOODS
AGRICULTURE SUPPORT
WEEDING SUPPORT
SADAQAH PROJECT

HEALTH CARE
EYE CARE
GIFT
QURBANI PROJECT
EMERGENCY AND DISASTER RELIEF
BLIND AND DISABLED PROJECT
WATER PROJECT
WIDOW SUPPORT

www.youtube.com/latifihands
www.facebook.com/latifihands
www.latifihands.org.uk

ঐতিহাসিক ভাষ্যে উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার:

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর অবদান

মাসুক আহমেদ

হিন্দুস্তান বর্তমান ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহাসিক নামগুলির একটি। এর আক্ষরিক অর্থ "সিন্ধু নদের দেশ"। হিন্দুস্তান এসেছে আদি ফার্সি শব্দ 'হিন্দু' থেকে। ফার্সি ভাষায় সিন্ধু নদকে বলা হতো হিন্দু নদ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'স্তান'। ফার্সি শব্দে স্তানের অর্থ 'জায়গা'। আগে হিন্দুস্তান বলতে গোটা উপমহাদেশকেই বুঝাতো। ঐতিহাসিকভাবে 'হিন্দু' কোনো ধর্মের নাম নয় বরং সিন্ধু নদের পাড়ে বসবাসরত মানুষদেরকে বুঝাতো, তারা যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন। অন্যদিকে বর্তমান হিন্দুধর্মের মূল নাম হচ্ছে সনাতন ধর্ম। কালের বিবর্তনে এখন হিন্দুধর্ম নামে পরিচিতি পেয়েছে। সারা বিশ্বের মুসলিমগণ অতীতে এই অঞ্চলকে "আল-হিন্দ বা হিন্দুস্তান" বলেই ডাকতেন এবং এখনও ডাকেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়েও এই উপমহাদেশকে বুঝানোর জন্য আল হিন্দ (الهند) নামটি ব্যবহৃত হয়েছে।

মুসলমানদের ভারত বিজয়

অখণ্ড ভারত উপমহাদেশে বহিরাগত যেসব মুসলমান এসেছিলেন, তাদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। ১. ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য এসে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার শুরু করেন ২.পীর, দরবেশ, সূফী যারা শুধুমাত্র ইসলামের বাণী প্রচারের জন্যই আসেন এবং সারা জীবন এখানেই কাটান ৩. মুসলমান বাহিনী, তৎকালীন অত্যাচারী শাষক গোষ্ঠীর শোষণ ও জুলুম থেকে মজলুম জনগণকে মুক্তি ও দেশজয়ের আকাঙ্খায় বিজয়ীর বেশে ভারতবর্ষে মুসলমানরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ এর সময়কালেই ইসলামের সুমহান বাণী ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছে। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার রাজ্য তথা বর্তমান কেরালায় ইসলাম প্রচারিত হয়। মুসলিম ঐতিহাসিক শায়খ সায়নুদ্দীন তাঁর 'তুহফাতুন নুজাহেদীন ফী বাযে আহওয়ালিল বারতাকালীন' গ্রন্থে বলেন, ভারতের মালাবার রাজ্যের রাজা চেরুমল পারুমল স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে মক্কা গমন করে মহানবী ﷺ এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। (ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, পৃ.- ৩৩, গোলাম আহমদ মোর্তজা, ইতিহাসের ইতিহাস, পৃ.- ৭৭)। সেই যুগে মালাবারে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে এবং প্রায় দশটি মসজিদ নির্মাণ হয়। বিশ্বকোষ প্রণেতা বলেন, মসজিদ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই এই অঞ্চলে মুসলমানদের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। (বিশ্বকোষ, ১৪ পৃ.- ৬১৮, গোলাম আহমদ মোর্তজা, প্রাগুক্ত, পৃ.- ৭৮)। পরবর্তীতে খলীফা উমর (রা.) এর খিলাফতের শেষের দিকে ওমান থেকে ভারতে প্রথম অভিযান হয় (ড. ইশ্বরী প্রসাদ)। হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর সময়েও অভিযানের তথ্য পাওয়া যায়। (Sugata Bose & Ayesha Jalal, Modern South Asia: History, Culture, Political Economy, 2nd Ed. p. 17,21) উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদের শাসনামলে ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের উদ্যোগে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সিন্ধু প্রদেশে মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে সিন্ধু প্রদেশ জয় করেন। এটা ছিল মুসলমানদের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক বিজয়। এরপর সুলতান মাহমুদ গজনবী ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত অভিযান করেন। সর্বশেষ শাহাবুদ্দীন নামে পরিচিত মুহাম্মদ মইজুদ্দীন ঘুরির মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী ও বৃহত্তর পরিসরে ভারতবর্ষে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচিত হয়। মুহাম্মদ ঘুরির সফল অভিযানের নেপথ্যে যেই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে তিনি হচ্ছেন সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়ায মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.)। (সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, ওমর আলী অনূদিত, সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস, পৃ.-৩৩)

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর ভারত আগমনের ইতিবৃত্ত

চিশতিয়া তরীকার ইমাম খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) হিজরী ৫ম শতকের ৩য় দশকে মধ্য এশিয়ার খোরাসানের অন্তর্গত সানজার নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ খাজা গিয়াস উদ্দীন, মাতার নাম সৈয়দা উম্মুল ওয়ারা মাহেনূর। পিতৃকূল ও মাতৃকূল উভয় দিক থেকে তিনি আওলাদে রাসূলের অন্তর্ভুক্ত। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) ছিলেন আধ্যাত্মিক বুযুর্গ হযরত উসমান হারুনী (র.) এর মুরীদ ও খলীফা। মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) নিজ পীর ও মুর্শিদের অনুমতিক্রমে জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত, দার্শনিকসহ অসংখ্য ওলীর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি বাগদাদ শরীফে বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর সাহচর্যে ৫৭ দিন অবস্থান করেন। এ সময় বড়পীর (র.) তাঁকে বলেছিলেন, ইরাকের দায়িত্ব শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীকে ও হিন্দুস্থানের দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হলো। একই সুসংবাদ তিনি নিজ পীর ও মুর্শিদ খাজা উসমান হারুনী (র.) এর সাথে মদীনা শরীফে অবস্থানকালে মহানবী ﷺ এর পক্ষ থেকে পেয়েছিলেন। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী মাত্র ৪০ জন সফরসঙ্গীকে নিয়ে হিন্দুস্থানে আসেন। এরপর বিরতিহীনভাবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি আরব হতে ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান হয়ে প্রথমে লাহোরে পরে দিল্লী হয়ে আজমীরে আগমন করেন। আজমীরে পৌঁছালে সেই সময়ের অত্যাচারী হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের প্রতিরোধের মুখে পড়েন। পৃথ্বীরাজ নানাভাবে তাঁকে উৎপীড়ন করার চেষ্টা করে। খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.) নিজেও জনগণের উপর পৃথ্বীরাজের অত্যাচার নির্যাতনে খুবই ব্যথিত ও অসন্তুষ্ট ছিলেন। পৃথ্বীরাজ এক পর্যায়ে তাঁর সাথে চরম অসৌজন্যমূলক আচরণ করলে তিনি এক টুকরো কাগজে লিখে পাঠান- 'মান তোরা যেন্দা বদস্তে লশকরে ইসলাম বছোপর্দম' অর্থাৎ আমি তোমাকে জীবিতাবস্থায়ই মুসলিম সেনাদলের হাতে সমর্পণ করলাম। ইতিপূর্বে মুহাম্মদ ঘুরি দুইবার (তাবাকাতে নাসেরি, তারিখে ফিরোজশাহী, তারিখে বাহাদুরশাহী ও তারিখে পৃথ্বীরাজ ইতিহাস গ্রন্থে সাতবার আক্রমণের কথা বলা হয়েছে) আক্রমণ করেও পৃথ্বীরাজের কাছে শোচনীয় পরাজয় লাভ করেছিলেন। মুহাম্মদ ঘুরি স্বপ্ন দেখেন খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.) তাকে আজমীরসহ সমগ্র হিন্দুস্তান বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করে অভিযানের আহ্বান জানিয়েছেন। ঘুরি এরপরেই পুনরায় আক্রমণ করেন এবং বিজয় লাভ করেন। এভাবে দিল্লীসহ বিভিন্ন অঞ্চল বিজয়ের মাধ্যমে সমগ্র ভারতবর্ষে দিল্লী

সালতানাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। মুহাম্মদ ঘুরি ভারতে দিল্লীতে মুসলিম শাসনের রাজধানী বানিয়ে কুতুবুদ্দীন আইবেককে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই সালতানাত ১২০৬-১৫২৬ পর্যন্ত ভারতবর্ষ শাসন করে। মুহাম্মদ ঘুরি খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। (তারিখে ফিরিশতা, ১ম খণ্ড, পৃ.- ৫৮, শেখ ফজলুল করিম, হযরত খাজা মুয়ীন উদ্দীন চিশতি জীবনচরিত, বাংলা একাডেমি, মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, চেরাগে চিশতী, হাকীমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া পৃ.- ৪৬, মাওলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক, সুলতানুল হিন্দ মুঈন উদ্দিন চিশতী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ.- ৪৬, ড. জহুরুল হাসান সারিব, মঈনুল হিন্দ, তাজ পাবলিশার্স, পৃ.- ৬৬)

ঐতিহাসিক ও প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ টি. ডব্লিউ আর্নল্ড, আরেক ঐতিহাসিক ইলিয়টের সূত্রে বলেন- ভারতে মুসলমান পীরদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান এবং ইসলাম প্রচারের অগ্রদূত হচ্ছেন খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.)। তিনি ছিলেন পারস্যের সিজিস্তানের অধিবাসী। তিনি হজ্জব্রত পালন উপলক্ষে মদীনায় গমন করলে মহানবী ﷺ স্বপ্নে তাঁর নিকট আগমন করে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ হিন্দুস্থানকে তোমার হাতে ন্যস্ত করেছেন। সেখানে চলে যাও এবং আজমীরে গিয়ে বসতি গড়ো। আল্লাহর সাহায্যে তোমার এবং তোমার অনুসারীদের ধর্মানুরাগের দ্বারা সে দেশে ইসলাম বিস্তার লাভ করবে। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) সে আহবানে সাড়া দেন এবং আজমীরে যাত্রা করেন। তখন এ দেশটি ছিল হিন্দুদের শাসনাধীনে। দেশব্যাপীই মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল। তাঁর দ্বারা দীক্ষিতদের প্রথম হচ্ছেন একজন যোগী যিনি ছিলেন স্বয়ং রাজার ধর্মগুরু। ক্রমান্বয়ে তাঁর পাশে বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাবেশ ঘটে। একজন ধর্মীয় নেতা হিসেবে তাঁর খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং বিরাট সংখ্যক হিন্দুকে আজমীরের দিকে আকৃষ্ট করে। তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে রাজী করান। আজমীরে আসার পথে তিনি একমাত্র দিল্লী শহরেই প্রায় ৭০০ লোককে ইসলামে দীক্ষিত করেন। (দি প্রিচিং অব ইসলাম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২, পৃ. ৩০৮)

ইসলাম প্রচারে অবদান

দিল্লী ও আজমীরে মুসলিম শাসন কায়িম হবার পর মধ্যপ্রাচ্যের বহু সূফী সাধক ভারতবর্ষে এসে ইসলাম প্রচারের মানসে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। তাদের অনেকেই খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর দুআ ও অনুমতি নিয়ে দূর দূরান্তের এলাকাসমূহে বসতি স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করতে থাকে। অপরদিকে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী তাঁর মুরীদদের মধ্যে বিশেষ তালিমপ্রাপ্ত ও জ্ঞানী মুরীদগণকে তরীকার খিলাফত প্রদান করে বিভিন্ন এলাকায় পাঠাতে থাকেন। উত্তর ভারত ও মধ্য ভারতের এমন কোন জনপদ ছিল না যেখানে তাঁর খলীফা পদার্পণ করেননি। এমনকি তৎকালীন বঙ্গদেশেও তাঁর খলীফাদের আগমন ঘটেছিল। এদেরই একজন সৈয়দ আবদুল্লাহ কিরমানী। ইনি বীরভূমে প্রচারকেন্দ্র গড়ে তুলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় বহু খলীফা প্রেরণ করেছিলেন। মোট কথা, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী একটা সর্বভারতীয় মিশন গঠন করে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। এ মহান মুবাল্লিগের প্রচেষ্টার ফলেই ভারতে ইসলামের সূর্য উদিত হয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ অন্য ধর্মাবলম্বী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে শরীআত ও মারিফতের পরম সুধা পানপূর্বক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করেছিল। কারো মতে আশি লক্ষ, আবার কারো মতে নিরানব্বই লক্ষ। (জিহাদুল ইসলাম ও ড. সাইফুল ইসলাম, দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন, অনুবাদ, পৃ.- ৫১৯) শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া (র.) সহ অনেকের মতে, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর কাছে ৯০ লক্ষ লোক ইসলাম গ্রহণ করে। (তারীখে মাশায়িখে চিশত, অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ.- ১৩৫) এনাম্যারি শিমেল বলেন-ভারতবর্ষে সর্ববৃহৎ আকারে ইসলামের প্রচার প্রসারে অগ্রনায়ক হচ্ছেন খাজা মুঈনুদ্দীন হাসান চিশতী। যিনি মহানবী ﷺ কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন এবং এর পরেই মইজুদ্দীন ঘুরি দিল্লী বিজয় করে দিল্লী ইসলামী সালতানাতের সূচনা করেন। (Annemarie Schimmel, Islam in the indian Subcontinent, 1980, p.-23) সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, সিয়ারুল আউলিয়া ও মাআছারুল কিরাম গ্রন্থদ্বয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "ভারতবর্ষ নামক দেশটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কুফর ও শিরকের রাজত্ব ছিল। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ ইট পাথর, গাছ-গাছড়া, পশু-পাখি, চন্দ্র-সূর্য, গোবর-বিষ্ঠা ইত্যাদির পূজা করে প্রণতি জানাতো। এরা রাসূল ﷺ এর আগমন সম্পর্কে ছিল বেখবর। 'আল্লাহু আকবার' আওয়াজ কেউ কোনদিন শোনেনি। আফতাব-ই-হিন্দ বা ভারতসূর্য খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির পবিত্র কদম এদেশের মাটিতে পড়া মাত্রই অজ্ঞতার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে শেরেকের কালো প্রতীক অবনমিত হয়ে তৎস্থলে খানকা, মসজিদ, মেহরাব ও মিম্বার থেকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি কর্ণ কুহরে প্রবেশ করতে থাকে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় উপমহাদেশের উপর চিশতিয়া সিলসিলার মহান বুযুর্গ ও মনীষীদের চিরন্তন দাবি ও অধিকার রয়েছে। এ দেশে যারাই ঈমান ও ইসলামের মহামূল্যবান সম্পদের অধিকারী হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেন এবং তাদের অধস্তন বংশধরগণ সবাই খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর আমলনামার অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকবে তার সাওয়াব শায়খুল ইসলাম খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর রূহ মুবারকে ততই পৌঁছতে থাকবে। (সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, উমর আলী অনূদিত, সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস, পৃ. ৩৩)

আদর্শ ও দর্শন

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর মিশন ছিল যালিমের বিপক্ষে মযলুমের মুক্তির সংগ্রাম। বিপুল সংখ্যক ধর্মান্তরের এই ঐতিহাসিক বিপ্লব জোরজবরদস্তি বা আরোপিত ছিল না বরং তাঁর দাওয়াতি নীতি ছিল ইসলামের শাশত আদর্শ, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ইনসাফের ভিত্তিতে সমুজ্জ্বল। ফলে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি ও নীতি আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ ইসলামকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে। এনাম্যারি শিমেল বলেন, 'খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর সূফী তরীকার মূলনীতি হলো সকলের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য। বিশেষ করে গরীব ও অভাবীদের সহযোগিতা করা।' (Annemarie Schimmel, Islam in the indian Subcontinent,1980, p.-24)

প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের মতে, মুহাম্মদ ঘুরি কর্তৃক ভারতবর্ষের মহাবিজয়ে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর দুআ, তাওয়াজ্জুহ ও আধ্যাত্মিক শক্তির এক বিরাট ভূমিকা ছিল। মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ূনী বলেন- এই বিজয় হযরত কুতুবে রব্বানী খাজা আজমিরী এর বরকতে হয়েছে (তাবাকাতে নাসিরী, পৃ.- ৪০, তারিখে ফিরিশতা, পৃ.- ৫৭, মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ পৃ.- ৫০, ৫৮)। মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর মাধ্যমে উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের সফলতার ব্যাপ্তি ও এই অঞ্চলে তাঁর দর্শনের সামাজিক প্রভাব এতোটাই সুদূরপ্রসারী ছিল যে ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জন বলেন- "The personality of the Great Khwaja was standard of greatness and excellence, today His Shrine carries the same standard. It is an undeniable fact that in India His Shrine virtually rules." (২০শে ডিসেম্বর, ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে পাশকৃত ৬ষ্ঠ রিপোর্ট তথা DURGAH KHAWJA SAHEB, AJMER ২(৯) ও ২(১০) নং অনুচ্ছেদেও উল্লেখ আছে)।

সৌদি-কাতার ও সৌদি-তুরস্ক সম্পর্কে নতুন সম্ভাবনা

রহমান মোখলেস

সৌদি আরব ও কাতার প্রায় সাড়ে তিন বছরের দ্বন্দ্ব-বিরোধের অবসান ঘটিয়ে সম্প্রতি সম্পর্কের নতুন সেতুবন্ধন রচনা করেছে। অন্যদিকে সৌদি-তুরস্ক সম্পর্কেও পরিবর্তন ও নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

সৌদি আরব ও কাতার পরস্পরের আকাশ, স্থল ও সমুদ্র সীমান্ত খুলে দিয়েছে। দেশ দুটির এই সমঝোতাকে মধ্যপ্রাচ্য ও আরব দেশগুলোর মধ্যে বড় মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর আগে গত ডিসেম্বরে সৌদি আরবের আল-উলা শহরে অনুষ্ঠিত হয় উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর আঞ্চলিক সম্মেলন। এ সম্মেলনেই কাতারের সঙ্গে উপসাগরীয় দেশগুলোর সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কাতারের আমীর শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি। শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানিকে স্বাগত জানান সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। চুক্তিকে মোহাম্মদ বিন সালমান নিজেদের মধ্যে 'সংহতি ও স্থিতিশীলতার' চুক্তি বলে মন্তব্য করেন। যুবরাজ বলেন, 'আমাদের অঞ্চলের উন্নতি ও চারপাশে থাকা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এখন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা জরুরী।'

এ চুক্তিতে পৌঁছার জন্য ভূমিকা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রেরও। যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন ভূরাজনৈতিক স্বার্থে উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোকে একজোট এবং ইরানের বিরুদ্ধে দেশগুলোকে এক কাতারে আনতে উদ্যোগ নেয়। এজন্য ট্রাম্পের জামাতা ও তৎকালীন মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষ দূত জারেড কুশনার গত বছরের শেষদিকে মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন এবং জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালান। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। আর এসবের ফলেই আজ সৌদি-কাতারের নতুন যুগের সূচনা।

উল্লেখ্য, কাতার একটি ছোট্ট দেশ। এর জনসংখ্যা মাত্র ২৭ লাখ। আর এর অধিকাংশই প্রবাসী। তেল ও গ্যাস সম্পদ দেশটিকে বিশ্বের ধনী দেশগুলোর মধ্যে একটিতে পরিণত করেছে। দেশটি এশিয়া ও ইউরোপে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।

বিরোধের নেপথ্যে:

২০১৭ সালের জুনে আচমকা কাতারের সঙ্গে সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেয় সৌদি আরব। কাতারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেশটি আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা তৈরি ও সন্ত্রাসবাদ উসকে দিচ্ছে। পাশাপাশি ইরান ঘনিষ্ঠতার অভিযোগও তোলা হয়। কাতারকে ইরানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক সীমিত এবং দোহাভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরা নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেওয়ারও দাবি জানায় সৌদি আরব।

ইরানের সঙ্গে আঞ্চলিক ক্ষমতার আধিপত্য নিয়ে সৌদি আরবের বিরোধ দীর্ঘ দিনের। ইরানের পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিরও বিরোধী সৌদি আরব। কাতারকে একঘরে করে উপসাগরীয় অঞ্চলে ইরানকে বন্ধুহীন করার লক্ষ্য ছিল সৌদি আরবের। কাতারের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের সঙ্গে সামিল হয় বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মিশর। পরে এই দেশগুলোর সঙ্গে যোগ দেয় ইয়েমেন, লিবিয়া ও মালদ্বীপ। আর এই সাতটি দেশই কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পাশাপাশি স্থল, নৌ ও আকাশপথে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় কাতারের সঙ্গে। আরোপ করে নিষেধাজ্ঞা ও অবরোধ। তবে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন করার অভিযোগ কাতার বরাবরই প্রত্যাখ্যান করে এসেছে।

এদিকে আঞ্চলিকভাবে কাতারের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। এটাও ছিল সৌদি আরবের উদ্বেগের একটি কারণ। কাতার ও তুরস্ক উভয় দেশই সিরিয়ায় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইরত ইসলামী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থনের নীতি গ্রহণ করে। তুরস্ক কাতারে সামরিক ঘাঁটিও স্থাপন করে। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ সরকারের পতন ঘটাতে দেশটিতে ইসলামপন্থী দলগুলো লড়ছে।

সৌদি নেতৃত্বে কাতারের বিরুদ্ধে উপসাগরীয় দেশগুলোর ব্যবস্থা গ্রহণে এ অঞ্চলে কাতার একঘরে হয়ে এক গভীর সংকটের মুখে পড়ে। কাতারের খাদ্যসামগ্রী আমদানির বেশির ভাগই হতো সৌদি আরবের সীমান্তপথে। স্থলপথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়ায় কাতারের নির্মাণশিল্পেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে ২০২২ সালে ফুটবল বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য কাতারের সক্ষমতাকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। বর্তমানে দুই দেশের সম্পর্কের উন্নয়ন ও বিরোধ মিটে যাওয়ায় এ আশঙ্কা এখন অনেকটাই কেটে গেছে। দেখা দিয়েছে নতুন আশার আলো।

সৌদি-তুরস্ক সম্পর্কেও নতুন চমক:

এদিকে সৌদি আরব ও তুরস্কের মধ্যে সম্পর্কে টানাপোড়েন দীর্ঘদিনের। মূলত আরব বিশ্ব ও মুসলিম দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দেশ দুটির মধ্যে সম্পর্কের অবনতি। আরব বিশ্ব ও মুসলিম দুনিয়ায় একচেটিয়া মোড়লীপনা ছিল সৌদি আরবের। মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মস্থান এবং দুই পবিত্র মসজিদের সেবক হিসেবে সৌদি আরবকে মুসলিম বিশ্ব আলাদা মর্যাদায় দেখে থাকে। অবশ্য ওসমানিয়া সালতানাত আমলে দুই পবিত্র মসজিদের তথা মক্কা ও মদীনার খাদিম ছিলেন তৎকালীন তুর্কি

ওসমানীয় শাসকেরা। পরবর্তীকালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে ওসমানীয় সালতানাতের পরাজয় এবং ব্রিটিশরা এ অঞ্চল থেকে চলে যাবার পর বর্তমান সৌদি আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই মুসলিম বিশ্বে সৌদি প্রভাবেরও শুরু। ২০১০ সালের শুরুতে পশ্চিমা শক্তির মদদে যে তথাকথিত 'আরব বসন্তে'র জাগরণ তার ঘোর বিরোধী ছিল সৌদি আরব। অন্যদিকে এর পক্ষের শক্তি ছিল তুরস্ক। এই তথাকথিত 'আরব বসন্তে'র পর থেকেই দেশ দুটির মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন ব্যাপক রূপ নেয়। এর আগে অবশ্য বাগদাদ চুক্তি, স্নায়ুযুদ্ধ, ইরান-ইরাক যুদ্ধসহ বিভিন্ন ইস্যুতে উভয় দেশকে একই কাতারে দেখা গেছে। কিন্তু সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি 'আরব বসন্তে'র পর থেকে। আর সবশেষে সদ্য সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রশাসনের চার বছরের শাসনামলে এই সম্পর্কের অবনতি চূড়ান্ত রূপ নেয়। এই সময় সৌদি বাদশাহর শারীরিক অসুস্থতার সুযোগে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানই হয়ে ওঠেন দেশটির ক্ষমতার কেন্দ্র। আর যুবরাজ বিন সালমানের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে ট্রাম্পের। অন্যদিকে ট্রাম্প আমলের পুরো সময় যুক্তরাষ্ট্র-তুরস্ক সম্পর্ক তিক্ততায় রূপ নেয়। এ সময় তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সৌদি কনস্যুলেট অফিসে সৌদি সাংবাদিক জামাল খাশোগি হত্যাকান্ড দুই দেশকে নিয়ে যায় একেবারে দুই মেরুতে। মোহাম্মাদ বিন সালমানের নাম মুখে না নিলেও তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান পরোক্ষভাবে এমন আভাস দেন যে, এই হত্যাকান্ডের নির্দেশদাতা যুবরাজই। অন্যদিকে এ হত্যাকান্ডে যুবরাজ বিন সালমানের হাত ছিল এমনটাই ধারণা আন্তর্জাতিক মহলেও। কিন্তু ট্রাম্পের সঙ্গে সুস্পর্কের কারণে এ থেকে অনেকটা রেহাই পেয়ে যান সৌদি যুবরাজ।

এদিকে ২০১৪ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদে তুরস্কের মনোনয়নের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে সৌদি আরব। বর্তমানে চলমান সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে শুরুতে দুই দেশ একই লক্ষ্যে মাঠে নামলেও কিছুদিন পরই তৈরি হয় বিভক্তি। লিবিয়ার গৃহযুদ্ধেও পরস্পরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় দেশ দুটি। ২০১৭ সালে সৌদি আরব-কাতারের বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা ও অবরোধ আরোপ করে দুই দেশকে তা আরও দূরত্বে নিয়ে যায়। এ সময় থেকে বিশেষ করে বর্তমান তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের আমলে মুসলিম বিশ্বে শুরু তুরস্কের প্রভাব বিস্তারের। সৌদিকে হটিয়ে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বে আসার চেষ্টা চালায় তুরস্ক। এ ক্ষেত্রে তুরস্কের লক্ষ্যনীয় তৎপরতাও দেখা যায়। ফিলিস্তিন, রোহিঙ্গা, কাশ্মীর, চীনের উইঘুর ইত্যাদি মুসলিম ইস্যুতে তুরস্ককে যতটা সোচ্চার দেখা গেছে, সৌদি আরবকে তেমন দেখা যায়নি। বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ এই অঞ্চলের মুসলিম দেশগুলোর সাথেও কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করে তুরস্ক। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ককেশাসসহ বিভিন্ন অঞ্চলেও তুরস্কের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। গত ১০ বছরে এরদোয়ান ৩০টি আফ্রিকান দেশে ২৮ বার সফর করেছেন। লিবিয়াতে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইরত খলিফা হাফতারকে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে তুরস্কই বড় ভূমিকা রেখেছে। অতি সাম্প্রতিক নাগোরনো-কারাবাখের যুদ্ধে আজারবাইজানের জেতার নেপথ্যেও তুরস্ক। অপরদিকে ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সুসম্পর্ক থাকায় রোহিঙ্গা ও কাশ্মীর ইস্যু সৌদির কাছে যতটা গুরুত্ব পাওয়ার কথা ছিল তা পায়নি।

নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত:

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের পরাজয় এবং জো বাইডেন ক্ষমতায় আসায় আরব বিশ্বেও শুরু হয়েছে পরিবর্তনের ইঙ্গিত। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সূত্র থেকে যে আভাস পাওয়া যায়, তাতে যুক্তরাষ্ট্রের সৌদি নীতিতেও পরিবর্তন আসতে পারে। তবে খুব সহসাই রাতারাতি সব পরিবর্তন ঘটবে তাও নয়। সৌদি আরব ছিলো মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের পর যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র। জো বাইডেন সব দেখে শুনেই এগুবেন। নির্বাচনের আগে ইরানের সাথে পারমাণবিক চুক্তি পুণরায় বাস্তবায়নের আভাস দিয়েছিলেন জো বাইডেন। তবে ক্ষমতা গ্রহণের পর বাইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্থনি ব্লিনকেনস এর সিনেট শুনানিতে নতুন মার্কিন প্রশাসনের পরারাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে খুব দ্রুত ট্রাম্পের সব নীতি পাল্টে দেওয়ার আভাস মেলেনি। তেমনটি হলে ইরান নীতিতেও খুব দ্রুত পরিবর্তন আসছে না। হোয়াইট হাউসের নতুন প্রেস সেক্রেটারি জেন সাকি বলেছেন ইরানের সাথে সমঝোতায় যেতে হলেও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। আর সৌদি নীতির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। সৌদির ক্ষেত্রে কিছুটা কঠোর হলেও রাতারাতি সৌদি আরবকে যুক্তরাষ্ট্র ছুড়ে ফেলবে তেমনটিও নয়। তবে ন্যাটোভুক্ত দেশ হিসেবে এখন তুরস্ককেও কাছে টানার চেষ্টা করবে যুক্তরাষ্ট্র। বাইডেন চাইবেন সৌদি ও তুরস্কের মধ্যে সমঝোতা। এদিকে বাইডেন প্রশাসনও জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে দেওয়া স্বীকৃতি থেকে সরে আসছেনা। তবে বাইডেন প্রশাসনের ইন্টেলিজিয়েন্স বিষয়ক প্রধান আভরিল হেইন্স ইতিমধ্যেই এ আভাস দিয়েছেন যে, জামাল খাসোগি হত্যাকান্ডে মার্কিন গোপন প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। সার্বিক এসব বিষয় ও পরিবর্তন নিয়ে যুবরাজ বিন সালমানও উদ্বিগ্ন। আর এই সব বিষয়ই তুরস্কের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে সৌদি আরবকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এমনটাই ধারণা আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের। বর্তমান পরিবর্তিত ব্যবস্থায় সৌদি আরব ও তুরস্ক উভয় দেশই কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি তুরস্কের ভূমিকম্পে সৌদি ত্রাণ পাঠানো তারই ইঙ্গিত। একই সময় সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজের সাথে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েব এরদোয়ানের টেলিফোন সংলাপও তেমনই ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে। বর্তমান ভূরাজনৈতিক ও বৈশ্বিক বাস্তবতায় দুই দেশই চেষ্টা করছে আবার এক কাতারে সামিল

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের পরাজয় এবং জো বাইডেন ক্ষমতায় আসায় আরব বিশ্বেও শুরু হয়েছে পরিবর্তনের ইঙ্গিত। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সূত্র থেকে যে আভাস পাওয়া যায়, তাতে যুক্তরাষ্ট্রের সৌদি নীতিতেও পরিবর্তন আসতে পারে।

হওয়ার। গত ডিসেম্বরে বিশ্বের বড় অর্থনীতির ২০টি দেশের জোট জি-টুয়েন্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সৌদি আরবে। করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে সম্মেলনটি হয়েছে ভার্চুয়ালি। সম্মেলনের প্রাক্কালে বাদশাহ সালমান নিজে উদ্যোগী হয়ে ফোন করেন রিসেপ তাইয়েব এরদোয়ানকে। সম্মেলনের বিষয় ছাড়াও পারস্পারিক সম্পর্ক নিয়েও তাদের মধ্যে আন্তরিক আলোচনা হয়। যতদূর জানা যায়, দুই নেতা আলোচনার মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যকার মতবিরোধ নিরসনে একান্ত আগ্রহী। সৌদি ও তুরস্কের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকেও তেমন ইতিবাচক আভাস পাওয়া যায়। এ সব থেকে দুই দেশের সম্পর্ক নতুন মোড় নিতে যাচ্ছে এমন চিত্রই ফুটে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে পরস্পর বিরোধী অবস্থানে থাকা বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দুটি মুসলিম দেশ সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী হয়ে ওঠায় মুসলিম বিশ্বেও নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। দেখা দিয়েছে সুরঙ্গের শেষে নতুন সম্ভাবনার আলো। দুই দেশের মধ্যে বৈরীতা নয়, সুসম্পর্কই চায় মুসলিম দুনিয়া। এতে বৈশ্বিক রাজনীতিতে মুসলিম বিশ্বের প্রভাব ও গুরুত্ব দুইই বাড়বে।

আন্দালুস! হারানো ঐতিহ্য, আমাদের আফসোস

আহসান হাবীব শাহ

৭ম শতাব্দীর ২য় দশকে আইবেরিয়া উপদ্বীপ তথা বর্তমান স্পেন এবং পর্তুগাল জয় ছিল মুসলিমদের এক ঐতিহাসিক বিজয়। সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদের জয় করা স্পেনকে মুসলমানরা নামকরণ করেছিল 'আন্দালুসিয়া'। 'আন্দালুস' শব্দটি আরবী। যার অর্থ- গ্রীষ্মের পড়ন্ত বিকেলে সবুজের সমারোহ। রাজধানী ছিল কর্ডোভা।

মুসলমানদের হাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক উজ্জ্বলতম কেন্দ্র ছিল স্পেন। দীর্ঘ সাতশত বছর স্পেন মুসলমানদের অধীনে ছিল। ইউরোপের বুকে একমাত্র মুসলিম ভূখণ্ড ছিল বলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ স্পেন অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপীয় রেঁনেসার উন্মেষে অনবদ্য অবদান রেখেছে। মুসলিম স্পেন যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সভ্যতা ও সংস্কৃতি চর্চায় নিমগ্ন তখন ইউরোপ অজ্ঞতা-বর্বরতায় নিমজ্জিত। লেনপুল উল্লেখ করেছেন, তখন গোটা ইউরোপ বর্বর অজ্ঞতা ও বুনো ব্যবহারে নিমজ্জিত ছিল।

ইউরোপীয়রা মুসলমানদের হাত হতে যখন স্পেন ছিনিয়ে নেয় তখন হতেই প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় রেঁনেসার সূত্রপাত হয়। মুসলিম স্পেন একটা উন্নত সভ্যতার পাদপীঠ ছিল। বিজ্ঞান চর্চা, শিল্প সাধনা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে তাঁরা এমন এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, তাদের ছাড়া সভ্যতার ইতিহাস অপূর্ণাঙ্গ রয়ে যায়। মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও নবী মুহাম্মদ e এর শিক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম দুনিয়া সর্বক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে। বাগদাদ, কনস্টান্টিনোপল, কর্ডোভায় মুসলিম উৎকর্ষতার চরম বিকাশ লাভ করে। তদানীন্তন বিশ্বে বাগদাদ, কনস্টান্টিনোপল ও কর্ডোভাই ছিল বিশ্বের সভ্যতার পীঠস্থান। কিন্তু কর্ডোভার সভ্যতা যেন সবাইকে অতিক্রম করেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে কর্ডোভার খ্যাতি ছিল বিশ্ববিখ্যাত। কর্ডোভার সভ্যতা আর জ্ঞানশিখা সমগ্র ইউরোপ গগনে রবি রশ্মির ন্যায় বিকীর্ণ হতো।

গোটা স্পেনই ছিল জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার এক আদর্শভূমি। প্রত্যেক শাসকই ছিলেন জ্ঞানানুরাগী বিদ্যোৎসাহী। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে স্পেন এমন এক স্বর্ণদ্বারে পরিণত হয়েছিল। ফ্রান্স, ইতালি, গ্যালিসিয়া, আফ্রিকা, সিরিয়া, মিশর, ইরাক, পারস্য প্রভৃতি দূর দেশ হতে ছুটে আসত বিদ্যাভূষণ পণ্ডিত প্রবর কবি-সাহিত্যিকগণ। তাঁরা সকলেই এখানে সমাদরে অভ্যার্হিত এবং সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত হতেন। প্রতিভা পূরণের সুযোগ পেয়ে বহু বিখ্যাত কবি, বৈয়াকরণিক এবং ঐতিহাসিকরা কর্ডোভায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। দার্শনিক মাইকেল স্কটও উচ্চ শিক্ষার জন্য স্পেনে এসেছিলেন।

কর্ডোভাতেই ছিল ২০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭০টি কলেজ এবং ৭০টি পাবলিক লাইব্রেরি। খলীফা মুনতাসির নিম্নবিত্তদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য স্থাপন করেন অবৈতনিক ২৭টি বিদ্যালয়। স্পেনে যখন প্রায় প্রত্যেকেই লেখাপড়া জানত তখন খ্রিষ্টান ইউরোপে গুটিকয়েক পুরোহিত ব্যতীত অন্যরা ছিল নিরেট মূর্খ।

কুরআন, আরবী ব্যাকরণ ও কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে স্পেনে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হতো। তাফসীর, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, আরবী ব্যাকরণ, অভিধান শাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে জ্যোতির্বিদ্যা, অংকশাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ধর্ম ও আইনশাস্ত্র বিভাগ নিয়ে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ বিষয়গুলো ছাড়াও রসায়ন ও দর্শন বিভাগ ছিল গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য। কারিগরি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, বক্তৃতা চর্চা ছিল এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুসলিম, ইহুদি, খ্রিষ্টান সমান অধিকার নিয়ে শিক্ষাগ্রহণ ও পাঠদানে নিয়োজিত থাকত। নবম শতাব্দীতে একমাত্র কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল এগারো হাজার।

স্পেনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিপুল তথ্য জানা যায় সেখানকার শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানীদের ঐতিহাসিক কার্যকলাপ এবং বিশ্বখ্যাত লাইব্রেরিসমূহের বহর দেখে। কাসিরির মতে, শুধু কর্ডোবাতেই ১৭০ জন শিক্ষাবিদ বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছিল। এখানকার বিজ্ঞানী ইবনুল খাতিব বিভিন্ন বিষয়ে একহাজার একশ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইবনুল হাসান চারশত আর ইবনুল হাইসামের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার। এক একটি অভিধান সমাপ্ত হতো ৪০-৫০ খণ্ডে। ইবনে হাবিব একহাজার, আব্দুল মালিক একহাজার, ইবনুল হাইসাম চারশটি, ইবনে হান চারশটি, ইবনে ইবান ও হুনায়েন ১০০টি, ইবনে হাইয়ান ৬০টি গ্রন্থ লিখেন।

স্পেনের প্রত্যেকটি শহরেই ছিল সরকারি গ্রন্থাগার ও সাধারণ পাঠাগার। গৌরবময় যুগে সেখানে ৭০টি সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল। এতে রক্ষিত ছিল লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ। ব্যক্তিগত লাইব্রেরি সে যুগে এক প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল। মন্ত্রী ইবনে আব্বাসের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে চার লক্ষ বই ছিল। সুলতান হাকামের পুস্তক তালিকা ৫০ খণ্ডে বিভক্ত ছিল। সাধারণ লোকদের গ্রন্থাগারে থাকত অজস্য গ্রন্থের সমাহার। ইবনুল আসরানের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে দশ হাজার, ইয়াহুদী চিকিৎসক দুনাশবেন তামিনের লাইব্রেরিতে ২০ হাজার পুস্তক ছিল। যখন ইউরোপের বৃহত্তম লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০০টি।

এরপরের ইতিহাস বড়ই করুণ! বড়ই নির্মম! আমরা ডুবে গেলাম বিলাসিতার মহাসমুদ্রে। প্রিয় কুরতুবা! আল হামরা মুসলিম সভ্যতার নিদর্শন হয়ে এখনো দাড়িয়ে আছে স্পেনে। রাস্তার পাশের গির্জার আকাশচুম্বী মিনারগুলো যদি কথা বলতে পারত, মানুষের মত দুঃখে কান্না করতে পারত, তাহলে হয়তো আমরা বুঝতে পারতাম যে, সেগুলো গির্জা নয়, আল্লাহর ঘর মসজিদ। এককালে এখানে সিজদায় লুঠিয়ে পড়েছিল কত পুণ্যাত্মা, কত ওলী, দরবেশ।

১৪৯২ সালের ২ জানুয়ারি আল-আন্দালুস আমাদের হাতছাড়া হয়। ক্রুসেডের ফলে আধুনিক ইউরোপ জন্মলাভ করে। খ্রিষ্টানরা স্পেন থেকে বসবাসরত মুসলমানদের নারকীয়ভাবে হত্যা ও বিতাড়িত করে এবং মুসলিম সভ্যতার স্থাপত্য নিদর্শনাবলি দখল করে নেয়। মুসলিমদের এই ভূখণ্ডটি ধীরে ধীরে খ্রিষ্টান রাজ্যে পরিণত হয়। শেষ হয়ে যায় ৮০০ বছরের ইসলামী আল আন্দালুস রাষ্ট্রের। আহ আন্দালুস! আমাদের হারানো ফিরদাউস!

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ

উম্মাহ দরদী এক উসমানী খলীফা

হায়দার ইবনে মোকাররম

খিলাফত পুনরুজ্জীবনের স্বপ্নদ্রষ্টা আরতুগ্রুল গাজী (র.)। ইউরেশিয়ার বসফরাস প্রণালির কাছে অর্ঘুজ তুর্কিদের কায়ী যাযাবর গোষ্ঠীতে ১১৯১ সালে তাঁর জন্ম। অর্ধবিশ্ব জয় করা দুর্দান্ত চেঙ্গিস খানের মোঙ্গল বাহিনীকে মাত্র গুটিকয়েক সৈন্য নিয়ে আহলাত ও সোগুতে প্রবেশ রুখে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সেলজুক সাম্রাজ্যের সুলতান আলাউদ্দীনের ভাতিজি হালীমা সুলতানা। তাদেরই ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন উসমানী খিলাফত তথা অটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মহানায়ক উসমান গাজী। আজ আমরা আলোচনা করব এই সাম্রাজ্যের এমন এক খলীফার কথা, যিনি স্বপ্ন, কর্ম, প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা এবং উন্নয়ন সকল ক্ষেত্রেই মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ নিয়ে ভাবতেন। তাঁর নাম আবদুল হামিদ, যিনি দ্বিতীয় আবদুল হামিদ নামে পরিচিত। তাঁকে উসমানী খিলাফতের সর্বশেষ প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে মনে করা হয়।

জন্ম ও শৈশব

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ছিলেন উসমানী সাম্রাজ্যের ৩৪তম খলীফা। তাঁর পিতা ছিলেন সুলতান প্রথম আবদুল মজিদ এবং মা তিরিমুজগান কাদিন। ১৮৪২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর ইস্তাম্বুলের তোপকাপি প্রাসাদে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি মাকে হারান। এরপর থেকে তিনি সৎমা রহিমা কাদিনের কাছে লালিত পালিত হন। সৎমায়ের ইবাদাত ও বিচক্ষণতা খলীফার মনে গভীর রেখাপাত করে। শৈশবে তিনি প্রাসাদের শিক্ষকগণের কাছ থেকে আরবী, ফারসী, অর্থনীতি, সাহিত্য ও ইতিহাসের উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানার্জন করেন। অশ্বারোহণ ও তরবারি চালনায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিতভাষী এবং আবিদ ব্যক্তি। শৈশব থেকেই তিনি রাত জেগে ইবাদাত-বন্দেগী করতেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ

১৮৬৮-৬৯ সালে চাচা ও তৎকালীন খলীফা আবদুল আজীজের সাথে ইউরোপ ভ্রমণ করেন। চাচা তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং খিলাফতের জন্য যোগ্য ব্যক্তি মনে করতেন। ইউরোপীয়দের সভ্যতা, সামরিক সক্ষমতা এবং

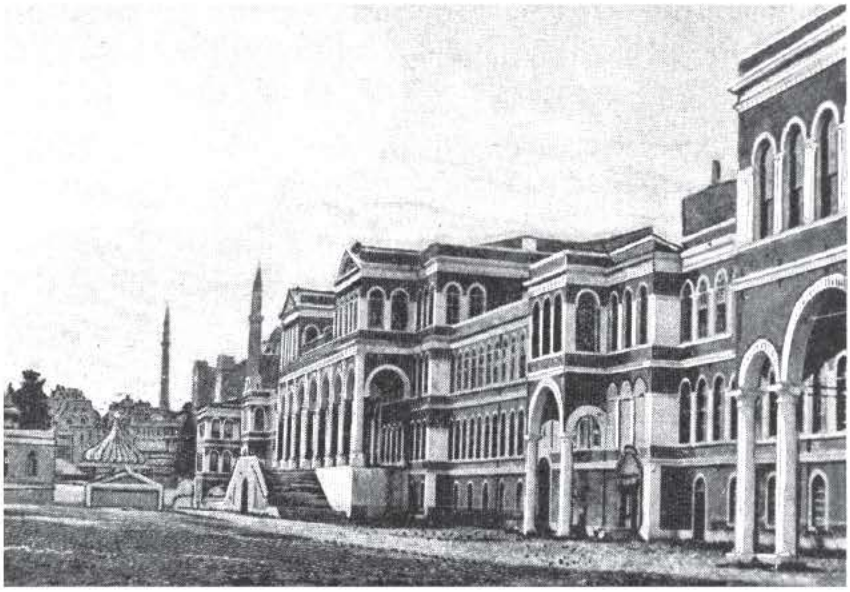

গোয়েন্দা তৎপরতা আবদুল হামিদকে এক নতুন জগতের সন্ধান দান করে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, উসমানী খিলাফত রক্ষা করতে হলে সামরিক সক্ষমতা এবং গুপ্তচরবৃত্তির ব্যাপক আধুনিকায়ন করতে হবে। পাশাপাশি ইউরোপীয় অনৈসলামিক সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে ইসলামী সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে।

আবদুল হামিদের খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের কোনো ইচ্ছে ছিল না। তাঁর পিতার জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন মসনদের তৃতীয় উত্তরাধিকার। ১৮৬১ সালে তাঁর পিতা সুলতান আবদুল মজিদ ইন্তিকাল করলে চাচা আবদুল আজীজ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৭৬ সালে তিনি নিহত হলে তাঁর ভাই পঞ্চম মুরাদ মসনদের হাল ধরেন। ধারণা করা হয়, চাচাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে ইয়াহুদী সংগঠন 'ফ্রি মিশনে'র সাথে পঞ্চম মুরাদেরও হাত ছিল। তার ক্ষমতারোহণের পর বিষয়টি স্পষ্ট হতে থাকে। পঞ্চম মুরাদ ইহুদী লবীর পরামর্শে খিলাফতকে বুনিয়াদি রাজতন্ত্রে পরিণত করেন। এতে খলীফা নামমাত্র শাসক হয়ে ওঠেন এবং নির্বাহী ক্ষমতা চলে যায় উযীর ও পাশাদের হাতে। মসনদে আরোহণের কয়েক মাসের মধ্যে ৫ম মুরাদের মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ ফুটে ওঠে। কয়েকমাস পর যখন কোনো অবস্থাতেই তাকে সুস্থ করা যাচ্ছিল না, তখন আবদুল হামিদের ডাক আসে। ইয়াহুদীবাদী ফ্রি মিশন এবং নব্য তুর্কিদের অনেক অন্যায্য শর্ত মেনেই ১৮৭৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তিনি খিলাফতের পদে আসীন হন। (তারিখে দাওয়াতিল উসমানীয়্যা, ইয়ালমায উসতুনা)

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আবদুল হামিদ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। একদিকে ইয়াহুদীবাদী ফ্রি মিশন সদস্যদের ব্যাপক তৎপরতা, অন্যদিকে ইউরোপীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত নব্য তুর্কি তরুণদের আস্ফালন খলীফার জন্য রাষ্ট্র পরিচালনাকে কঠিন করে তুলেছিল। পাশা হিসেবে পরিচিত তুর্কি সামরিক-প্রশাসনিক আমলাদের চাপে খলীফা মিদহাত পাশাকে খলীফার প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রথমদিকে মূলত, খিলাফতের মুখোশে মিদহাত পাশার নেতৃত্বাধীন আমলারা অটোমান সাম্রাজ্য শাসন করে। তারা খিলাফতের সমূহ ক্ষতি হয় এরকম অনেক সিদ্ধান্ত খলীফার উপর চাপিয়ে দেয়। তাদের সিদ্ধান্তে ১৮৭৭-৭৮ সালে রুশদের সাথে অটোমানদের এক রক্তক্ষয়ী সংঘাত ঘটে এবং অটোমানরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। এই পরাজয়ের পর

খলীফা পাশাদের লাগাম টেনে ধরেন। মিদহাত পাশা বলয়ের বহু পাশাকে পদচ্যুত করেন। ৫ম মুরাদের জারি করা রাজতান্ত্রিক তথা বুনিয়াদি সংবিধান বাতিল করেন এবং নির্বাহী ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। খলীফা মিদহাত পাশার অপসারণের পর তার ব্যাপারে লিখেন "মিদহাত পাশা আমাকে নির্দেশ দিত, যেন সে আমার উপর সকল কর্তৃত্বের অধিকারী। তার স্বেচ্ছাচারিতাই আমাদের এ খিলাফতকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে।" (অটোমান অ্যাম্পায়ার, ড. মুহাম্মদ আলী সাল্লাবি)

মুসলিম উম্মাহ'র স্বার্থে উন্নয়ন কার্যক্রম

নির্বাহী ক্ষমতা গ্রহণের পর খলীফা মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে একের পর এক চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত নেন। তিনি হিজাজ রেলওয়ে চালু করে ইস্তাম্বুল ও ফিলিস্তীনের সাথে মদীনা শহরকে সংযুক্ত করেন। রুশ-উসমানীয় যুদ্ধের সময় ব্যাপক ঋণের বোঝা সাম্রাজ্যকে ভারী করে তুলছিল। খলীফা এসব ঋণ পরিশোধে আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। আব্বাসী খিলাফতের সময়ে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানার্জন ও গবেষণাগার 'বায়তুল হিকমাহ'র অনুকরণে দারুল ফুনুন নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের গবেষকদের জন্য এটি উন্মুক্ত করে দেন। বর্তমানে এটি ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। তিনি মক্কা শহরকে বন্যা থেকে রক্ষার জন্য আধুনিক পানি সঞ্চালন লাইন তৈরি করেন, যা আজও বিদ্যমান।

খলীফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি স্বতন্ত্র ইউনিয়নের চেষ্টা চালান। কিন্তু পশ্চিমা দেশ ও ইয়াহুদী লবীগুলো তাকে এ মহৎ কাজটিতে সফল হতে দেয়নি। ভারত ও বিশ্বের নানা প্রান্তে গড়ে উঠা সাম্রাজ্যবাদের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তিনি রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখান করে মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কোথাও মুসলিম আগ্রাসন, রাসূল ﷺ এর অপমান হয় এমন কিছু দেখলে গর্জে উঠতেন। বিশেষত, ব্রিটিশ-ফরাসি উপনিবেশবাদের জন্য তিনি ছিলেন মূর্তিমান আতঙ্ক।

মুহাম্মদ আলী সাল্লাবি বলেন, খলীফা তাঁর পাশাদের এক বৈঠকে বলেছিলেন, যখন তোমরা দেখবে তোমাদের শত্রুরা তোমার কোনো কাজের প্রশংসা করছে, তখন বুঝবে তোমার এই কাজের দ্বারা শত্রুর স্বার্থরক্ষা হয়েছে। আর যখন তোমার কোনো কাজে শত্রু নিন্দা করবে, তখন বুঝবে মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণকর কাজে শত্রুর শরীরে আগুন জ্বলছে। (অটোমান অ্যাম্পায়ার)

রাসূল ﷺ এর প্রতি ভালোবাসা

১৯০৫ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে রাসূল ﷺ এর চরিত্রকে ব্যঙ্গ করে একটি নাটক প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করা হয়। খলীফা আবদুল হামিদ এ খবর জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি দূতাবাসের কূটনীতিক প্রধানকে ডেকে পাঠান। খলীফাকে তখন প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল। তিনি রাষ্ট্রদূতকে এ ঘটনা অবহিত করেন এবং নাটক প্রদর্শনী বন্ধ না হলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। ফরাসি সরকার টেলিগ্রামের মাধ্যমে এ সংবাদ জানতে পেরে আতঙ্কিত হয়ে মাত্র চৌদ্দ ঘন্টা আগে নাটকটির প্রদর্শনী বাতিল করে। এ সংবাদ খলীফার কানে এলে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি আফসিন পাশাকে বলেন, আবদুল হামিদ বেঁচে থাকতে রাসূল ﷺ এর অবমাননা সহ্য করা হবে না। (Abdul Hamid: The Sultans. Abdullah al Muraisi.)

১৯০৭ সালে আবদুল্লাহ নামে এক ব্যবসায়ী খলীফার প্রাসাদে আসে। সে দাবি করে, খলীফার তাঁর নিকট চার হাজার লিরা ঋণী। রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা ব্যবসায়ীকে পাগল ভেবেছিলেন। সারাদিন অপেক্ষার পর যখন সে অবিরত এই দাবি করছিল, তখন একজন ঊর্ধ্বতন পাশা খলীফাকে জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। কৌতূহলী খলীফা লোকটিকে কাছে ডাকেন এবং বিস্তারিত ঘটনা বলতে বলেন। ব্যবসায়ী লোকটি বলল, তাঁর ব্যবসা দুর্বৃত্তের খপ্পরে পড়ে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত। গত রাত সে রাসূল ﷺ কে স্বপ্নে দেখে। তাঁর দুঃসহ পরিস্থিতি শোনে রাসূল ﷺ বললেন, তুমি আমার আবদুল হামিদের কাছে গিয়ে বলবে তোমাকে চার হাজার লিরা দিয়ে দিতে। লোকটি তখন বলল, খলীফা কেন আমাকে ঋণ দেবেন? রাসূল ﷺ বললেন, আমার হামিদ প্রতিরাতে আমার উপর দরূদ পাঠ করে। গতরাতে সে কেন পাঠ করেনি? এজন্য তাকে ঋণশোধ করতে বলবে। একথা শোনে খলীফার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়তে লাগল। তিনি বললেন, গতরাতে রাষ্ট্রীয় চিন্তায় এতটাই চিন্তামগ্ন ছিলাম যে, দরূদ শরীফ পাঠ না করে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বুঝতে পারিনি। এরপর সেই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 'আমার আবদুল হামিদ' শব্দটি চারবার শোনলেন এবং প্রতিবার একহাজার লিরা করে ব্যবসায়ীকে প্রদান করলেন। (Abdul Hamid: The Spiritual Leader of Ottoman Khilafah.. Stench Hamdallah)

বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি ভালোবাসা ও ইয়াহুদী-ইংরেজ আঁতাত

১৯০১ সালে মিজ্ররারো কারো নামে বিশ্ববিখ্যাত এক ইয়াহুদী ব্যাংকার খলীফা আবদুল হামিদের কাছে আসে। সে অটোমান খিলাফতের সমস্ত ঋণ পরিশোধ, অটোমান খিলাফতের জন্য বিনা সুদে ৩ কোটি ৫০ লাখ লিরা ঋণ এবং অটোমান সেনাবাহিনীর জন্য একটি অত্যাধুনিক নৌঘাটি তৈরি করে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। এর বিনিময়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে নির্বিঘ্নে ইয়াহুদীদের প্রবেশ, অবস্থানের সুযোগ এবং জেরুজালেমের কাছে একটি ছোট্ট ইয়াহুদী বসতি স্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। খলীফা সে ব্যবসায়ীকে বলেন, ''যে ভূমি আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) জয় করেছেন আমি সে ভূমি তোমাদের বসবাসের জন্য খুলে দেব, এটা ভাবার দুঃসাহস করলে কীভাবে! আমি শাহাদাত চাই, মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে মরতে চাই না।" (Abdul Hamid: The Sultans. Abdullah al Muraisi.)

এ ঘটনার পর ইয়াহুদীরা বুঝে যায়, খলীফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ক্ষমতায় থাকতে তারা আরবে কোনো রাষ্ট্র গঠন করতে পারবে না। তৎকালীন ইয়াহুদী প্রধান ইসরাঈল রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা থিওডোর হার্জেল খলীফার সাথে দেখা করতে এলে তিনি তাকে সাক্ষাৎ প্রদানে রাজি হননি। পরবর্তীতে হার্জেল ২০ মিলিয়ন পাউন্ডের মাধ্যমে সারা বছর ইহুদীরা বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রার্থনা করার অনুমতি চায়। (অটোমান খিলাফতের সময় ইয়াহুদীরা তিন ঘন্টা অবস্থানের শর্তে প্রতি বছর মাত্র একমাসের জন্য জেরুজালেমে প্রবেশ করতে পারত।) খলীফা হার্জেলের এই প্রস্তাবও নাকচ করে দেন। ফিরতি চিঠিতে তিনি লেখেন, তারা যেন এই পরিকল্পনা নিয়ে আর অগ্রসর না হয়। তাদেরকে জেরুজালেমের এক মুঠো মাটিও দেওয়া হবে না, যেহেতু এটার মালিক তিনি নন। এটা মুসলিমদের রক্তে কেনা ভূমি। (তারিখে দাওয়াতিল উসমানীয়্যা, ইয়ালমায উসতুনা)

ইয়াহুদী হার্জেল হাল ছাড়েনি। সে ব্রিটিশদের সাথে আঁতাত করে এবং ব্যাপক সম্পদ আর ভোগ্যপণ্যের প্রলোভন দেখিয়ে অটোমান সেনাবাহিনীর একটি অংশকে সুলতানের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলে। ওয়াহাবী মতবাদের সমর্থক আরবের প্রভাবশালী নেতৃত্ব ক্ষমতার মোহে ইয়াহুদী লবীর সুপারিশ অনুযায়ী খিলাফতের অধীন মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক ফাটল সৃষ্টি করে। জায়ানিস্ট, নব্য তুর্কি তরুণ, ইংরেজ বেনিয়া, সম্পদের মোহে অন্ধ শক্তিশালী পাশাদের ষড়যন্ত্র খলীফাকে ক্রমেই দুর্বল করে তুলে। ১৯০৮ সালে খলীফার

বিরুদ্ধে এক সম্মিলিত অভ্যুত্থান সংগঠিত হয় এবং খলীফা পুনরায় রাজতান্ত্রিক শাসন জারি করতে বাধ্য হন। খলীফার সুপ্ত ইচ্ছে ছিল, পুনরায় খিলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন। এজন্য ১৯০৯ সালে তার অনুগত সৈন্যরা পুনরায় বিপ্লব শুরু করে। জয়নবাদীদের দুর্দান্ত তৎপরতায় তা ব্যর্থ হয় এবং খলীফাকে ক্ষমতাচ্যুত করে নির্বাসনে পাঠানো হয়। তাঁর ভাই পঞ্চম মুহাম্মদ নামমাত্র সুলতান হন।

ইন্তিকাল

খলীফা আবদুল হামিদ নির্বাসিত অবস্থায় মুসলিম উম্মাহর জন্য আকুল হয়ে কাঁদতেন। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য তিনি কারও সাথে দেখা করতে পারতেন না। তার সহকারী হিসামিদ্দীন বলেন, খলীফা খিলাফতে আরোহণের পর থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রায়শই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, 'হয় খিলাফত, নয় শাহাদাত।' গৃহবন্দি অবস্থায় ১৯১৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তিনি বেইলেরবিক প্রাসাদে ইন্তিকাল করেন। তিনিই ছিলেন অটোমান সাম্রাজ্যের সর্বশেষ প্রকৃত খলীফা।

তাঁর সম্পর্কে বিভিন্নজনের বক্তব্য

খলীফা আবদুল হামিদ ছিলেন বিভিন্ন ষড়যন্ত্রকারী সাহিত্যিক, সাংবাদিকের লেখনির নির্মম শিকার। তাঁর বিরুদ্ধে জনমত গঠনে এসব বিষয় অনেকটা প্রভাব ফেলেছিল। তবুও তাকে অভ্যুত্থানের সময় তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ব্রিটিশ ইতিহাসবেত্তা আর্লন্ড টয়েনবি ১৯১৭ সালে প্রকাশিত তার ইতিহাসগ্রন্থ Turky: A Past and A Future এ বলেন, "সুলতান আবদুল হামিদের অনন্য উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের মুসলিমদের একই পতাকার নিচে একত্রিত করা। নিঃসন্দেহে তা ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাল্টা পদক্ষেপ। দুঃখের বিষয়, তাঁর বিরুদ্ধে ইউরোপীয়রা এত বেশি লিখেছে যে, আর কোনো মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে তারা এতটা লিখেনি। মুসলিমদের উচিৎ ছিল তাঁর পাশে থাকা। কিন্তু তাদের চিরায়ত অনৈক্য তা হতে দেয়নি, না হলে মুসলমানদের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লিখতে হতো।"

খলীফা ইন্তিকালের আট বছর পর অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী আনোয়ার পাশা একটি সাক্ষাতকারে বলেছিলেন, '' আমাদের ভুলটা বলি, আমরা খলীফার বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে করতে কখন যে জয়নবাদীদের (ইয়াহুদীদের) ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছি, তা নিজেই জানতাম না। আমরা নির্বোধ ছিলাম, মুসলিম বিশ্বকে এর ফল ভোগ করতে হবে।" (Abdul Hamid: The Spiritual Leader of Ottoman Khilafah. Stench Hamdallah)

নব্য তুর্কি নাস্তিকদের প্রেরণাদাতা তুর্কি কবি রেজা তাওফিক নিজেদের ভুল অনুধাবন করে বলেছিল,

''আপনার পক্ষে থাকবে ইতিহাস
আপনাকে হারিয়ে করি হাসফাঁস।
নির্লজ্জভাবে চাপিয়ে অপবাদ
পেয়েছি কাফেরের কাছে পরাজয়ের স্বাদ।
আমাদের করুন ক্ষমা হে সৎ খলীফা
তাহলে মনে পাব শান্তির শিফা।
(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

খিলাফতের বিলুপ্তি

খলীফা আবদুল হামিদের পতনের পর অটোমান শাসন নামমাত্র টিকে ছিল। জামাল, তালাত ও এনভার পাশার একের পর এক হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী সাম্রাজ্য প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লিসবন চুক্তির মধ্য দিয়ে ১৯২৪ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। সমাধি হয় ১২৯৯ সাল থেকে ৬২৫ বছর ধরে চলা সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী খিলাফতের।

এর পরের ইতিহাস বেদনার কাঁটাঘেরা ইতিহাস। মুসলিম শাসকগণ পাশ্চাত্যের কাছে অবিরত আত্মসমর্পণ করতে থাকেন। অভিভাবকহীন মুসলিমগণ মার খেতে থাকেন বিশ্বের নানা প্রান্তে। পশ্চিমাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি আর কর্তৃত্বে সীমাহীন অন্ধকারে ডুবে যায় মুসলিম বিশ্ব।

مدرسة دار الإحسان اللطيفية لتحفيظ القرآن ، سلهت

দারুল ইহসান লতিফিয়া হিফজুল কোরআন মাদরাসা

বি # ব্লক, মেইন রোড, বাসা নং # ১৩, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।
মোবাঃ ০১৭৩৮-৮২৫০২৭ (অফিস), e-mail: darulihsansylhet@gmail.com

আবাসিক | অনাবাসিক | ডে-কেয়ার

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ

- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতাদর্শী ইসলামী ভাবধারা ও সুন্নতে নববীর আদর্শে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।
- ইয়াকুবিয়া হিফজুল কুরআন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত ও হুফফাজে প্রশিক্ষণ এবং সনদপ্রাপ্ত শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে হিফজ সম্পন্নের প্রচেষ্টা।
- আন্তর্জাতিক মানের হিফজের পাশাপাশি বয়স অনুপাতে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা।
- গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা-পড়ার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান।
- প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে সাপ্তাহিক সেমিনার, ইসলামি সংস্কৃতির চর্চা, বিভিন্ন দিবস উদযাপন, প্রতিযোগিতা ও শিক্ষাসফর সহ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।
- স্কুল/অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে আগত দুর্বল ও পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা।
- মানসম্পন্ন খাবার ও আবাসন ব্যবস্থা।

ভর্তি চলছে

- হিফজ বিভাগ
- হিফজ রিভিশন
- নাজারা বিভাগ
- সাবাহি মক্তব
- ইভেনিং কোর্স

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগাঃ (প্রধান শিক্ষক) ০১৭৫১-১৪৮৮২১

উজবেকিস্তানে ওলী-আউলিয়ার পাশে

মারজান আহমদ চৌধুরী

মধ্য এশিয়া, সাবেক রাশিয়ান ও চীনা তুর্কিস্তান এলাকা ও মঙ্গোলিয়ার একটি অংশ নিয়ে যে বিশাল জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান ছিল সেই তুর্কী-মঙ্গোল জাতি এক সময় সারা পৃথিবীব্যাপী দাপিয়ে বেড়িয়েছে। বর্তমান তুরস্কের অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ এক সময় এই মধ্য এশিয়া থেকেই এশিয়া মাইনরে চলে গিয়েছিল।

ফারগানা শহরের সাথে কেবল চিকিৎসক-দার্শনিক ইবনে সিনার নামটিই জড়িত নয়। এ জায়গার ইতিহাস আরও সমৃদ্ধ। ১৫২৬ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত ভারত শাসন করা মোঘল রাজবংশের শেকড় এই জায়গার সাথে জড়িয়ে আছে। ১৪৮৩ সালে ফারগানা শহরের দক্ষিণ-পূর্ব আন্দিজান এলাকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবর। সম্রাট বাবর তাঁর পিতার দিক থেকে খোঁড়া পায়ের বিশ্বজয়ী তৈমুর লং-এর বংশধর। মায়ের দিক থেকে মঙ্গোল সম্রাট চেঙ্গিস খাঁ বাবরের পূর্বপুরুষ। ইতিহাসে তৈমুর ও চেঙ্গিস উভয়েই রক্তপিপাসু চরিত্র হিসেবে পরিচিত। ১২৫৮ সালে Fall of Baghdad বা বাগদাদের পতনের মূলে ছিলেন চেঙ্গিসের নাতি হালাকু খাঁ। বর্বর মঙ্গোলদের হামলায় তখন ১০ লক্ষাধিক মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। ডুবে গিয়েছিল আব্বাসী খেলাফতের ম্রিয়মাণ সূর্য। মুসলিম উম্মাহ'র রাজনৈতিক কেন্দ্র আরব জাহান থেকে সরে গিয়ে প্রথমে মিশর এবং পরে আনাতোলিয়া বা আধুনিক তুরস্কে স্থানান্তরিত হয়েছিল। সারা পৃথিবীতে ত্রাস সৃষ্টি করা মঙ্গোলদেরকে যখন বিশ্ববাসী অতিমানবীয় শক্তি ভাবতে শুরু করেছিল, তখন এই মুসলিম উম্মাহ'র হাতেই আটকে গিয়েছিল মঙ্গোলদের অগ্রযাত্রা। ১২৬০ সালে বর্তমান ইসরায়েলের গ্যালিলি হ্রদের তীরবর্তী আইন জালুত যুদ্ধে মঙ্গোল বাহিনীকে প্রথমবার সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করেছিল সুলতান সাইফুদ্দীন কুতুয ও সেনাপতি যাহির বাইবার্সের নেতৃত্বাধীন মামলুক মুসলিম বাহিনী। মঙ্গোল সাম্রাজ্যের শেষের শুরু নির্ধারণ করে দিয়েছিল এই আইন জালুত যুদ্ধ।

ফারগানা থেকে আমরা ফিরলাম বোখারা মূল শহরে। সন্ধ্যায় চলে গেলাম মসজিদ-ই-কালান পরিদর্শনে। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, মসজিদ-ই-কালান দাঁড়িয়ে আছে বোখারার সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থাপত্যের সাক্ষ্য নিয়ে। এ মসজিদটি মূলত একটি কমপ্লেক্স, যার বিভিন্ন অংশ ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকের সাক্ষী হয়ে আছে। সর্বপ্রথম ৭১৩ সালে এ এলাকায় মসজিদ নির্মাণ শুরু হয়। ১১২১ সালে এ নির্মাণকে গতি দান করেছিলেন কারাখান বংশের শাসন আরসালান খাঁ। মঙ্গোল সম্রাট চেঙ্গিস খাঁ বোখারা আক্রমণ করে বেশিরভাগ মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীতে এগুলো আবার নির্মিত হয়। আজকের মসজিদ-ই-কালান নির্মিত হয়েছিল ১৫১৪ সালে। ২০৮টি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মসজিদটিতে ২৮৮টি গম্বুজ শোভা পাচ্ছে। মূল নামাযের জায়গা মসজিদের ভেতরে। তবে বাইরের কোর্টইয়ার্ড অনেক প্রশস্ত। ভেতরে প্রবেশ করার আগে মূল তোরণের ওপর চোখে পড়ে সুবিশাল একটি নীলাভ গম্বুজ। এ কমপ্লেক্সটির সৌন্দর্য আমাদের চোখ সহ্য করছিল না। মানুষের রুচি ও সক্ষমতার ওপর নতুন করে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস জন্মেছিল। প্রায় ৮-৯ তলার সমান উঁচু একেকটি তোরণ এবং মিনারাত। পাথরের

ওপর খোদাই করা নিখুঁত কারুকার্য, জ্যামিতিক পরিমাপের ত্রুটিহীন ব্যবহার, ক্যালিগ্রাফিক পদ্ধতিতে অঙ্কিত পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং হাদীস, মেজেতে মোজাইক। শুনেছি সোভিয়েত কমিউনিস্ট শাসনামলে এগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। সৃষ্টিশীল উজবেক জাতি তাঁদের ইতিহাসকে পুনরায় নতুন কলমে লিখেছে। বৃহত্তর বোখারা প্রদেশের বেশিরভাগ জায়গা এখন UNESCO ঘোষিত হেরিটেজ।

মসজিদ-ই-কালানকে ছাপিয়ে এ কমপ্লেক্সের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হয়ে আছে কালান মিনারাত। বাকো নামক এক স্থপতির তৈরি এ মিনারাত প্রায় দেড়শ ফিট উঁচু। নিচের দিকে এর প্রশস্ততা প্রায় সাড়ে উনত্রিশ ফিট। ভেতরের দিকে বাঁকানো সিড়ি দিয়ে ওপরে উঠা যায়। যদিও আমরা সে সুযোগ পাইনি। ইট-পাথর-বালু দিয়ে সে সময় এত বিশাল একটি স্থাপত্য নির্মাণ করা কত কঠিন ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। এ মিনারাত যেন স্থাপত্যকলার সব বিস্ময়কে একত্রিত করে মুগ্ধতার আবহ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আরেকটি তথ্য উল্লেখ না করলেই নয়। সেটি হচ্ছে, কালান মিনারাত এক সময় ব্যবহৃত হতো শাস্তি প্রদান করার কাজে। দাগী অপরাধীদেরকে এ মিনারাতের ওপরে তুলে নিচে ছুড়ে ফেলা হতো।

মসজিদ-ই-কালান কমপ্লেক্সের ভেতরেই অবস্থিত ঐতিহাসিক মাদরাসা আরাবিয়া। এ মাদরাসাকে মীর-ই-আরব মাদরাসাও বলা হয়। ১৫৩৬ সালে এ এলাকার শাসক উবায়দুল্লাহ খাঁ এ মাদরাসা তৈরি করেছিলেন। তিনি তিনবার ইরান আক্রমণ করে অনেক অর্থবিত্তের মালিক হয়েছিলেন। অর্জিত সম্পদ দিয়ে তিনি একটি ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। সে ইচ্ছার ফলশ্রুতিতেই তৈরি হয়েছিল মীর-ই-আরব মাদরাসা। উবায়দুল্লাহ খাঁ তাঁর মুর্শিদ শায়খ আবদুল্লাহ ইয়ামেনীর নামে এ মাদরাসার নামকরণ করেছিলেন। শায়খ আবদুল্লাহ ইয়ামেনী মীর-ই-আরব নামে এ এলাকায় খ্যাতিমান ছিলেন। সোভিয়েত আমলে এ মাদরাসাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে আবার সেটি শুরু হয়েছে।

এ মাদরাসায় অনেক শিক্ষার্থী পেলাম। নিজেদের ভাষা ছাড়াও ইংরেজি, আরবি দুটিই ভালো জানে। দীর্ঘ সময় ধরে কথা চলল। আকীদার দিক থেকে এরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী। ফিকহের দিক থেকে হানাফী, তরীকার দিক থেকে নকশবন্দী। তাঁদের সিলেবাস আমাদের মাদরাসার সিলেবাসের সাথে অনেকাংশে মিলে। তাঁদের ব্যবহারিক মাধুর্য যে কাউকে মুগ্ধ করতে বাধ্য।

প্রথমদিকে আমার মনে হয়েছিল, উজবেকরা ইসলাম চর্চায় পিছিয়ে আছে। কিন্তু কথাটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। নামাযের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা, ইসলামের মৌলিক বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান অবাক করার মতো। সোভিয়েতের ফাঁসির মঞ্চ থেকে গ্রীবা ছাড়িয়ে উজবেক জাতি আবার উষার রঙে নিজেদেরকে রাঙাচ্ছে। প্রাচীন মাদরাসাগুলো আবার 'ক্বালাল্লাহ' এবং 'ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহ'-এর শব্দে সজীব হয়ে ওঠছে।

পরদিন আমাদের কর্মসূচিতে ছিল তরীকা নকশবন্দিয়্যাহ'র দুই খ্যাতিমান বুযুর্গ শায়খ আলী রামিতানী (র.) এবং মুহাম্মদ বাবা সাম্মাসী (র.) এর যিয়ারত। শায়খ আলী রামিতানী ছিলেন খাজা মাহমুদ আনজির ফাগনাভীর খলীফা। ১৩১৫ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। এরপর গেলাম তাঁর খলীফা মুহাম্মদ বাবা সাম্মাসীর কবর যিয়ারতে। শায়খ সাম্মাসী সায়্যিদ আমির কুলালের মুরশিদ, এবং সায়্যিদ আমির কুলাল সায়্যিদ বাহাউদ্দীন নকশবন্দ বুখারীর মুরশিদ। উল্লেখ্য, তরীকা নকশবন্দিয়্যার এ সিলসিলাকে তাসাউফের সোনালি ধারা (Golden Chain) বলা হয়।

বিকেলে গিয়েছিলাম পুরোনো বোখারা মার্কেটে। ভুবনবিখ্যাত সিল্ক রোডের মধ্যখানে অবস্থিত এই বোখারা শহর সহস্রাব্দের ব্যবসায়িক ইতিহাসকে বুকে ধারণ করে বসে আছে। সময় বদলেছে; বোখারাবাসীর রুচি কিন্তু ওই একই আছে। সেই সিল্ক, সেই কটন, সেই উটের পশমের তৈরি কাপড়, নকশাদার আসবাবপত্র, হাতে আঁকা ছবি, শো পিস, অলংকার। বোখারা এখনও তার রঙ হারায়নি। তবে বাজারগুলো আমাদের মতো সরগরম না। বাকি জায়গাগুলোর মতো বাজারও শূন্য, খাঁ খাঁ করছে। হঠাৎ দু একজনকে দেখতে পাওয়া যায়। মূলত বিদেশী পর্যটকরা খদ্দের হয়ে উজবেকদের সৌখিন ব্যবসাপাতির চরকায় জ্বালানি যুগিয়ে দিচ্ছে।

পরদিন গিয়েছিলাম ইমাম আবূ হাফস আল-কাবীর (র.) এর যিয়ারতে। পুরোনো বোখারা শহর থেকে ৫০০ মিটার উত্তরে তাঁর কবর অবস্থিত। ইমাম আবূ হাফস ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস আশ-শাফিঈ (র.) এর সতীর্থ। তাঁরা দুজন একত্রে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী (র.) এর কাছে ইলম অর্জন করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী (র.) ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর ছাত্র। ইমাম আবূ হাফস তাঁর যুগের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আলিম ও ফকীহ ছিলেন। মধ্য এশিয়া (তৎকালীন বৃহত্তর খোরাসান) অঞ্চলে যে তিনজন মহান ব্যক্তির হাত ধরে ফিকহে হানাফীর আগমন ও প্রসার ঘটেছিল, ইমাম আবূ হাফস আল-কাবীর তন্মধ্যে একজন। বাকি দুজন হলেন হিদায়াহ গ্রন্থকার ইমাম বুরহান উদ্দীন মুরগিনানী (র.) এবং ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দী (র.)। এসব মনীষীদের মহান খিদমতের কাছে আমরা ঋণী হয়ে আছি।

এ পর্যায়ে উজবেকদের খাবার-দাবার সম্পর্কে একটু বলতে হয়। উজবেকিস্তানে যে খাবারগুলো আমরা খেয়েছি, বেশিরভাগই তৈলাক্ত, ঝালহীন, সেদ্ধ সেদ্ধ। লবণ মরিচ নেই বললেই চলে। প্রথম তিন দিন ধরে তাঁরা আমাদেরকে একই রেস্টুরেন্টে প্রায় একই খাবার পরিবেশন করেছে। এটির নাম ছিল আফসানা রেস্টুরেন্ট। বুফে, তাই হরেক পদের খাবার। কিন্তু এসব কত খাওয়া যায়! প্লাভ (পোলাও), ভেড়ার মাংস, সেদ্ধ সবজি আর ক্রিকেট বলের সাইজের মুরগির টুকরো খেতে খেতে মুখে অরুচি ধরে গেছে। স্যুপও লবণ-মরিচবিহীন। আমাদের এক সফরসঙ্গী তো এক পর্যায়ে বলেই ফেললেন, "এই স্যুপে তো দেখি কোনো মাসলা-মাসায়িল (মসলা) নেই।" একেক বেলা বাস এসে আফসানা রেস্টুরেন্টের সামনে থামত, আর আমরা হতাশ হতাম। আবার একই জিনিস খেতে হবে! একবার তো আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছিলাম, "হায় আল্লাহ, আবার আফসানা?" ইসলামি চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষক মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী হেসে বললেন, "আফসানা (কাহিনী) তো সেটি, যা বারবার ফিরে আসে।"

তবে মূল খাবারের পর মিষ্টান্নভোজ ছিল মনে রাখার মতো। নানা পদের মিষ্টি, কেক, ফলমূল এখনও মুখে লেগে আছে।

পরদিন আমরা বোখারা ত্যাগ করলাম। এবার আমাদের যাত্রা সমরকন্দ। বিশাল বাসের বহরে আমরা চললাম সমরকন্দের উদ্দেশ্যে। সমরকন্দ, যে শহরকে বলা হয় Gem of the East বা প্রাচ্যের রত্ন। খোঁড়া পায়ের বিশ্ববিজয়ী সেনাপতি তৈমুর লং-এর শহর এ সমরকন্দ। শহরটি অনিন্দ্য সুন্দর। বোখারার চেয়েও সুন্দর। কথার কথা বলছি না, সত্যিই এই শহরটি জীবন্ত রত্ন। তবে প্রাচ্যের রত্ন সমরকন্দ এবং সমরকন্দের রত্নরাজির গল্প আসবে পরবর্তী পর্বে।।

[চলবে]

একজন অমুসলিমের সাথে আলাপচারিতা

মুহাম্মদ সুফিয়ান বিল্লাহ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। অশেষ সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর উপর। মুসলমান হিসেবে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য অত্যাবশ্যক। জ্ঞানার্জন ব্যতিরেকে যে কাউকেই অন্ধকারে জীবন যাপন করতে হবে। মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে জ্ঞান অর্জনকারীর পুরস্কার বর্ণনা করে ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ উন্নীত করবেন। বস্তুত, আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত।" (সূরা মুজাদালাহ, আয়াত-১১)

বিষয়টি বুখারী শরীফের অত্যন্ত সুন্দর একটি হাদীস দ্বারাও সমর্থিত। যেমনটি আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যদি কারো মঙ্গল চান, তাহলে তিনি তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন। (সহীহ বুখারী)

ব্রিটেনে একজন অমুসলিমের সাথে আমার নিজ কথোপকথনের একটি অভিজ্ঞতা এবং ইসলামী জ্ঞান অনুসন্ধানের গুরুত্ব তারা কতটুকু অনুভব করে, তা উল্লেখ করছি।

আমার উপর মহান আল্লাহর অশেষ রহমত যে, তিনি আমাকে তাঁর মহান গ্রন্থ কুরআন মাজীদের ছাত্র হিসেবে কবূল করেছেন, যার ফলে তাঁরই অসীম করুণায় আমি অন্যদেরও কুরআন শিক্ষা দিয়ে থাকি। ব্রিটিশ মুসলিমদের (বিশেষত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতদের) সাধারণ একটি রীতি হচ্ছে, তারা তাদের সন্তানদেরকে স্কুল থেকে আসার পর সন্ধ্যায় স্থানীয় মসজিদে আল্লাহর দ্বীন (ইসলামী জ্ঞান) শিখতে পাঠান। সারাদিন স্কুলে বিভিন্ন সেক্যুলার বিষয়াবলি যেমন- ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, কম্পিউটিং ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা শেষে অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানদেরকে ইসলামী জ্ঞান শেখানোরও প্রয়োজন মনে করেন। তাই তারা সন্ধ্যায় তাদের সন্তানদেরকে মক্তব অথবা মসজিদে পাঠান।

আলহামদুলিল্লাহ, যুক্তরাজ্যে আমাদের অনেক মসজিদ আছে, যেগুলো শুধুমাত্র দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই নয় বরং সপ্তাহান্তে ও সন্ধ্যায় চমৎকার এবং মূল্যবান সম্পূরক ইসলামী শিক্ষালয় হিসেবেও কাজ করে।

সে হিসেবে আমিও লন্ডনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মসজিদ 'ব্রিকলেন জামে মসজিদে' কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিচ্ছি।

একজন শিক্ষক হিসেবে শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা দেওয়াই নয়, বরং বাস্তব জীবনেও এর প্রয়োগ শেখানো আবশ্যক।

একদিন পাঠদানের সময় নিকটবর্তী হচ্ছিল, এবং আমরা ছাত্রদের মসজিদে আসার অপেক্ষা করছিলাম। ইতোমধ্যে ছাত্রদের অনেকেই তাদের নির্ধারিত শ্রেণিকক্ষে এসে পৌঁছেছেন। এমন সময় একজন মা তার ছেলেকে ভর্তি করতে আসেন এবং এ নিয়ে তিনি শিক্ষকের সাথে কথা বলতে চান। যেহেতু ক্লাস শুরুর অনেক সময় তখনো বাকী ছিল এবং অনেকেই এখনো আসেনি। তাই আমি আমার সাধ্যমত সাহায্য করতে এগিয়ে গেলাম।

আমি নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কোনো সাহায্য করতে পারি কী? তিনি জানতে চাইলেন, তার ছেলে এ সন্ধ্যাকালীন মাদরাসায় এসে কী শিখবে? আমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলাম, আমাদের মাদরাসায় কী শেখানো হয়, এখানে কয়টি স্তর আছে এবং একজন ছাত্র ক্লাসে কতক্ষণ ব্যয় করে ইত্যাদি। সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার পর ছেলেটির মা গভীরভাবে বোঝার জন্য বিভিন্ন পাঠ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি এর জবাবে সিলেবাস সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা দিলাম এবং ছাত্ররা এটা কীভাবে সম্পন্ন করবে সেটাও তুলে ধরলাম।

উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন ছাত্র কোনো পূর্ববর্তী শিক্ষা ছাড়াই মসজিদে তার প্রাথমিক ইসলামী শিক্ষা শুরু করে, তখন কায়দা অনুসারে তাকে আরবী বর্ণমালা শেখানো হয়। এটা সাধারণত 'লেভেল ওয়ান' (প্রথম স্তর) নামে পরিচিত। এ স্তরে আরবী বর্ণমালা শেখার পাশাপাশি তারা কিছু দুআও শেখে, যেগুলো তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত এবং সাথে তাদেরকে ইসলামী আদব, আখলাকও শেখানো হয়।

আমি আরো ব্যাখ্যা করলাম, আরবি বর্ণমালা শেখার পর ছাত্রদেরকে বিভিন্ন হরকত (যের, যবর, পেশ) দিয়ে বর্ণমালা পড়ানো হয়; এরপর শুরু হয় পবিত্র কুরআন মাজীদের আমপারা (আমপারা) পড়ানো, যা 'লেভেল টু' (দ্বিতীয় স্তর) হিসেবে পরিচিত। আমপারা পড়ানোর পাশাপাশি এই লেভেলেই নামাযের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসাঈল, আকীদা ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমপারা শেষ করার পর শিক্ষার্থীদের কুরআন মাজীদ বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াতে দক্ষ করা হয় যার জন্য মূলত তারা মাদরাসায় এসেছিল। তাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, যা একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যক ও নামাযের জন্য প্রয়োজনীয় সূরা শিক্ষা দেওয়া হয়।

ছাত্ররা যখন কুরআন মাজীদ পড়া শুরু করে, যা সাধারণত লেভেল থ্রি (তৃতীয় স্তর) হিসেবে পরিচিত; তখন তাদেরকে তাজবীদের নিয়ম-কানুন পড়ানো হয়, যাতে তারা সঠিক ও শুদ্ধভাবে তারতীলের সাথে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতসহ তাদের পূর্ববর্তী বিষয়গুলোর দুআ, আকীদা, ফিকহ, ইসলামী ইতিহাস, হিফয শিখন অব্যাহত রাখে। প্রতিটি স্তরেই ছাত্রদের সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে পাঠদান ক্রমাগত অগ্রসর হয়।

আমাদের কথোপকথন শেষে তিনি অনেকটা হতবাক চোখে সন্তুষ্টচিত্তে মূল বিষয়টি স্পষ্ট করলেন, যেজন্য তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

তিনি বলেন যে, তিনি একজন খ্রিষ্টান। যদিও একজন মুসলমানকে বিবাহ করেছেন এবং তাদের একটি পুত্র সন্তান জন্ম হওয়ার পর বুঝতে পারলেন, সন্তানের জন্য অল্প বয়স থেকেই ইসলামী জ্ঞানার্জন জরুরী। তারপর তিনি জানতে পারলেন, এই উদ্যোগটি অন্য কোনো ধর্মের দ্বারা করা হয় না, অথচ তিনি আত্মবিশ্বাসী যে, তার পুত্র ধর্ম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করবে।

যদিও এই অভিভাবক আমাদের ধর্মের নয়, তবুও তার আগ্রহ আমাকে অভিভূত করেছে। তিনি নিজে ইসলামের অনুসারী না হলেও আমাদের ধর্মের শিক্ষা ও চর্চা তার সন্তানের বেড়ে ওঠা ও উন্নতির জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা ঠিকই তিনি অনুধাবন করেন। আর এজন্যই তিনি ইসলামী শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক মনে করে তার সন্তানকে মাদরাসায় পাঠাতে চান।

আমি এই বিষয়টি সবার নজরে আনতে চাই যে, দুর্ভাগ্যবশত অনেক ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত মুসলিম তাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছেন। যেমন- আল্লাহর কিতাব পড়া ও শেখা, প্রয়োজনীয় দুআ শেখা এবং ইসলামের মৌলিক জ্ঞানার্জন সম্পর্কে সচেতন থাকার বিষয়ে অবহেলা করছেন। অথচ এক্ষেত্রে অনেক অমুসলিম আছেন, যারা আমাদের ধর্মাবলম্বী না হলেও, আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন।

আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি, আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে প্রয়োজনীয় মূল্যবান জ্ঞান দান করুন, যা আমাদেরকে দুনিয়াও আখিরাতে সাহায্য করবে। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে তার দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং হিদায়াত দিন। আমীন।

বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া'র পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ স্মারক 'সুবহে সাদিক'

ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ স্মারক

সুবহে সাদিক

১৪৪২ হিজরী-২০২০ ঈসায়ী

সম্পাদকমণ্ডলির সভাপতি
আখতার হোসাইন জাহেদ

সম্পাদক
হুমায়ূনুর রহমান লেখন

সহকারী সম্পাদক
মোজতবা হাসান চৌধুরী নোমান
সৈয়দ আহমদ আল জামিল

সহযোগিতায়
সুলতান আহমদ
মাহবুবুর রহমান ফরহাদ
জাহেদুর রহমান

বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া জাতীয় পর্যায়ে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের পাশাপাশি দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ভূমিকা রাখা এক ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন। সুদীর্ঘকাল ধরে এ সংগঠন পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষ্যে স্মারক প্রকাশ করে আসছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রেরিত বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামীন ও শেষ নবী খাতামুন নবীয়্যিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। অনুপম মর্যাদায় গোটা সৃষ্টি জগতে তিনি অনন্য। বিশ্বে সর্বোচ্চ সম্মানে উদযাপিত হয় তাঁর পবিত্র জন্মদিন। বাংলাদেশের মুসলমানরা ও এ উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানাদি এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রকাশনার আয়োজন করেন। প্রকাশিত হয় স্মারক সংকলন। বিশ্বনবীর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাতধর্মী এসব সংকলনের কয়েকখানা জাতীয় পর্যায়ে সুপরিচিত। মহানবী প্রেমিকদের জন্য সাহিত্য মানোত্তীর্ণ ও উপস্থাপনায় শিল্প-সৌকর্যমণ্ডিত এসব বার্ষিকী সুপ্রিয় উপহার স্বরূপ। সুবহে সাদিক তেমনি একখানা মীলাদুন্নবী ﷺ স্মারক।

হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী এর দুআ দিয়ে সূচিত সুবহে সাদিক এ সংখ্যার লেখকমণ্ডলিতে রয়েছেন আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) (অনুবাদঃ মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী), সায়্যিদ মুহাম্মদ ইবনু আলাভী আল মালিকী (র.) (অনুবাদঃ মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান), মাওলানা মো. ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী, মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার (র.), মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ড. মুস্তাফিজুর রহমান, মুফতি মাওলানা মো. গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, রুহুল আমীন খান, অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, অধ্যাপক এম এ রকিব, ড. মুহাম্মদ সিদ্দিক, অধ্যাপক ড. মো. আবদুল কাদির, ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, ড. সৈয়দ শাহ এমরান, ড. আবদুল আজীজ আল-হেলাল, মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম পারভেজ, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ফারুকী প্রমুখ।

এতে রয়েছে রাসূল ﷺ এর নসবনামা, বৈশিষ্ট্য, দীদার, সুবিচার, অনুপম আদর্শ, তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় দেখা, সর্বকালে শ্রেষ্ঠত্ব, প্রশাসনিক কাঠামো, 'উসওয়াতুন হাসানা', পাশ্চাত্য পন্ডিতের সাক্ষ্য, বিশ্বমানবতার জন্য রহমত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, দাম্পত্য জীবন, হুনায়নের যুদ্ধ, শৈশব ও বাল্যকাল, নারী অধিকার ও নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দয়াদ্রতা ও মীলাদুন্নবীর শিক্ষাসহ বহুমুখী তাত্ত্বিক ও তথ্য সমৃদ্ধ সংকলন।

অনুবাদ কাব্যে কাসীদাতুন নু'মান, মূলঃ ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইবনু সাবিত (র.) (কাব্যানুবাদঃ মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান), মদীনা মুনাওয়ারাকে অভিনন্দন, মূলঃ শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (র.) (কাব্যানুবাদঃ মোহাম্মদ খছরুজ্জামান)।

নিবেদিত কাব্য পঙক্তিমালায়- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের দুটি কবিতাংশ ('মরু ভাস্কর' থেকে 'অবতরণিকা' ও 'নও-কাবা')।

কবিতায় অন্যান্যঃ আবদুল মুকীত চৌধুরী, আ. শ. ম. বাবর আলী, খালেক বিন জয়েন উদ্দীন, মুস্তাফা মাসুদ, ফারুক নওয়াজ, মহিউদ্দিন আকবর, আরিফ মঈনুদ্দীন, মালেক মাহমুদ, খান চমন ই-এলাহি, আলেয়া বেগম আলো, ফরিদ সাইদ, নুরুল ইসলাম মানিক, মিলন সব্যসাচী, মানসুর মুজাম্মিল, আখতার হোসাইন জাহেদ।

নিবেদিত ছড়া-কবিতায় পিয়ার মাহমুদ, মু. ছাদিকুর রহমান শিবলী, হাবিব ফয়েজী, মাহবুবুর রহীম, শাহীদ আহমদ, মাসুক আহমদ, আবুল ফজল মোহাম্মদ ত্বাহা, আলিম উদ্দিন আলম, এস এম মনোয়ার হোসেন, তাজ উদ্দিন আহমদ তাজুদ, মুহাম্মদ ইসলাম উদ্দিন শরীফ, রেদওয়ান মাহমুদ, আবু হেনা মুহাম্মদ ইয়াসিন, সেলিম আহমদ কাওছার, সামিউল ইসলাম, সাইদুল সানি, ফাইরুজ হুমায়রা কর্ণ ও রিয়াদুল জান্নাত শিফা।

অনুবাদ কাব্য, নিবেদিত কাব্য পঙক্তিমালা, না'ত ও ছড়া কবিতায় রয়েছে রাহমাতুল্লিল আলামীনের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বিশ্বে ইসলামী উজ্জীবনের সংগ্রামী স্বাপ্নিক রাহবার আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী (র.)-এর দুআর স্মৃতিধন্য সংগঠন বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া থেকে পবিত্র মীলাদুন্নবী ﷺ স্মারক প্রকাশ অব্যাহত থাকুক, এই প্রত্যাশা।

---আবদুল মুকীত চৌধুরী

খাতুন

কিভাবে গড়বেন আপনার সন্তানকে

শামীমা জাফরিন

প্রত্যেক বাবা-মার কাছে সবচাইতে প্রিয় এবং অমূল্য সম্পদ তাদের সন্তান। সন্তানের মধ্য দিয়েই প্রতিটি মানুষ বেঁচে থাকে। ভ্রুণ থেকে শুরু হয় সন্তানের শারীরিক এবং মানসিক প্রস্তুতি। তার জন্য পিতা-মাতা দুজনেরই সুসম্পর্ক সন্তানের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। ভ্রুণ থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পরও শিশু বড় না হওয়া পর্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ এবং পুষ্টিকর খাওয়ার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আপনার সন্তান যখন একটু একটু কথা বলতে শিখবে তখন থেকে তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। কারণ শিশু মাত্রই অনুকরণপ্রিয়। তখন সে মা এবং পরিবারের সবাই কি করে, কিভাবে কথা বলে-সবকিছুই সে হুবহু রপ্ত করতে চেষ্টা করে। কাজেই, শিশুর সামনে সব সময় সাবধান এবং সচেতন হতে হবে এবং মাকে সে সকল ব্যাপারে খুবই সতর্ক হতে হবে। কিভাবে খেতে হবে, কিভাবে চলতে হবে, বড়দের সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে। এখন যে বিষয়টির অভাব অনেক শিশুর মধ্যেই দেখা যায় সেটা শিক্ষা নয়; সুশিক্ষার অভাব। ছোটকালে কোনো বাচ্চা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বললে পরিবারের অনেকে এসব শুনে আনন্দ পান এবং কেউ আসলে তাদের সামনে তার ঐ ধরনের কথার খুব প্রশংসা করে এবং তাদের সামনে সে বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করে। খুব হাসাহাসি করেন, আনন্দ পান। এতে সে শিশু এসব ব্যাপারে উৎসাহিত হয়, যা পরবর্তীতে তাকে এসব ব্যাপারে সহজ করে ফেলে। অনেক সময় শিশু তার বয়সের চেয়ে পরিপক্ক কথা বলে থাকে। এ ক্ষেত্রে তাকে ধমক কিংবা প্রশ্রয় কোনোটাই দেওয়া ঠিক নয়, তাকে সে কথাটা সহজভাবে এবং ভালো ভাবে পরিবারের সদস্যরা বিশেষভাবে মা ব্যাখ্যা করে বুঝালে সে আর সে ধরনের কথা খুব একটা বলবে না। শিশু যদি যৌথ পরিবারের হয় তবে সেক্ষেত্রে পরিবারের প্রত্যেককেই তাকে সুন্দর-সুস্থ মানসিকতা নিয়ে বড় হতে সাহায্য করতে হবে। মনে রাখতে হবে, স্বভাবসুলভ চপলতা প্রতিটি শিশুর মধ্যেই থাকবে। সব সময় সেজন্য তাকে শাসনের মধ্যে রাখলে তার মানসিক বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাড়াবে। তার অনুসন্ধিৎসু মন তার চারপাশের সব কিছুই জানতে চাইবে। সে ক্ষেত্রে সে অনেক কিছুই ভয়ে জানতে চাইবে না। তার চারপাশের সব কিছুই তার অজানা, সব কিছুই নতুন। তাকে ঐসব কিছু জানতে সাহায্য করতে হবে। এটা তার অধিকার। কাজেই বিষয়গুলো ধৈর্যের সাথে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে তার কাছে বর্ণনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, পরিবারই তার প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র। আর একজন মাকে হতে হবে একজন দক্ষ, সফল, সুস্থ মনের শিক্ষয়িত্রী। অনেক বাচ্চা অনেক ধরনের খাবার খেতে চায় না। সেক্ষেত্রে মাকে সে খাবারের গুণাগুণ এবং না খেলে শরীর তার ক্ষতিকর দিক আকর্ষণীয়ভাবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে গল্পাকারে বর্ণনা করতে হবে। এতে সে গল্পের ফাঁদে পড়ে যেতে বাধ্য হয় এবং এর ফলে দেখা যায় অনেক বাচ্চা তেঁতো খাবারও পর্যন্ত খুব সহজেই খেয়ে থাকে। অনেক বাচ্চা যখন-তখন নানা জিনিসের বায়না ধরে এবং তাকে সে জিনিস না দেওয়া পর্যন্ত কান্নাকাটি করতে থাকে। কিন্তু আপনার পক্ষে সব সময় তা দেওয়া সম্ভব নয় কিংবা অনেক সময় মনে নাও থাকতে পারে। তারা কিন্তু কথার ছলে অনেক কিছু ভুলে যায়। তার কাছে আপনার অপারগতার বিষয়টি লুকানোর প্রয়োজন নেই। তার কাছে সহজভাবে বলবেন অপারগতা কিংবা মনে না থাকার কথা। খেলনার ব্যাপারে খেয়াল রাখা দরকার যে চমকপ্রদ জিনিসগুলো তাকে অপরাধ প্রবণতার দিকে ঠেলে দিতে পারে সে ধরনের খেলনা না দেওয়াই উচিত। যেমন- অনেক বাবা-মাকে তাদের সন্তানদের বন্দুক, পিস্তল কিনে দিতে দেখা যায়। এতে সে তার সাথীদের সাথে অনেক সময় খেলতে দেখা যায় যে, সে মস্তান হয়ে তার বন্ধুকে গুলি করে। এটা তার কাছে খুব সহজ একটা খেলা। কিন্তু এটার খারাপ দিক অবশ্যই রয়েছে। যার প্রভাব পরবর্তীতে তাকে অনেক সময় অপরাধী হতে সহজ করে তুলতে পারে। শিশুর খেলা হওয়াটাই আনন্দদায়ক। বিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স অথবা ক্ষতিকর কিছু না হয়ে যে কোনো যুগোপযোগী জিনিস যা থেকে শিশু ক্ষতিকর কিছু শিখবে না, সে রকম খেলনা দিবেন। শিল্পের সাথে, সাহিত্যের সাথে ছোটকাল থেকেই তাকে পরিচিত করা দরকার। এজন্য গল্পের বইগুলো তাকে দুপুরে কিংবা রাতে ঘুমানোর আগে আকর্ষণীয়ভাবে পড়ে শুনাবেন। নবী-রাসূলদের সত্য কাহিনী, সাহাবা কাহিনী তাদের শুনাতে হবে। এসব গল্প শুনতে তারা দারুণ পছন্দ করে। এগুলো তাদের আয়ত্তে যে সব শব্দ আছে সে সব শব্দগুলো ব্যবহার করে তাদের মতো করে ছোট ছোট বাক্যের সমন্বয়ে আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করলে তারা যেমন আকর্ষণ অনুভব করবে, গুরুত্ব দিবে, তেমনি তাদের মানসিক বিকাশের পাশাপাশি আদর্শিক মনোভাব গড়ে উঠবে। ইসলামী আদর্শে গড়ে উঠার স্পৃহা জাগবে। অতএব আপনি শিশুকে ছোটকাল থেকেই ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে। যেমন- কোনো শিশুকে তার মা ঘুমানোর আগে আল্লাহর নাম নিয়ে শুতে বলতে পারেন। তিনি মুখে মুখে কালিমা, সূরা পড়াতে পারেন। অত:পর তার নিজেকে গড়ার জন্য, সবার জন্য, দেশের জন্য সুন্দর সুন্দর কথার সমন্বয়ে মুনাজাত করাতে পারেন- খারাপ কাজ করলে পাপ হবে, পাপটা কি, তার ক্ষতিকর দিক, পুণ্য কি, কি তার ভালো দিকগুলো বলা। এতে তার মনে ছোটকাল থেকে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হবে এবং সে শিশু বড় হলে নৈতিকতা বিরোধী কাজ অপেক্ষাকৃত কম করে থাকে। যদি সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার শিকার হয়ে কিছু করে থাকে তারপরও তার মধ্যে অনুশোচনা হয়ে থাকে এবং তার মনে ভালো হওয়ার চেষ্টা জাগে। তাছাড়াও তাদের চলাফেরায় অনেক সময় ত্রুটি থাকে যা তারা অনেক সময় বুঝে এবং না বুঝে করে থাকে। এসব ব্যাপারগুলো তাদের সাথে সুন্দর, সহজভাবে আলাপ করে ত্রুটি সংশোধনে সচেষ্ট হতে হবে। তাহলে তারা আস্তে আস্তে ক্ষতিকর দিকগুলো পরিহার করবে এবং সুন্দর রুচিকর মার্জিতপূর্ণ বিষয়গুলোতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং সে নিজে, পরিবারের, সমাজের এবং দেশের একজন সুনাগরিক হয়ে বেড়ে উঠবে। গড়ে তুলবে সঠিক সুষ্ঠু নেতৃত্বের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধশালী দেশ ও আদর্শ রাষ্ট্র।

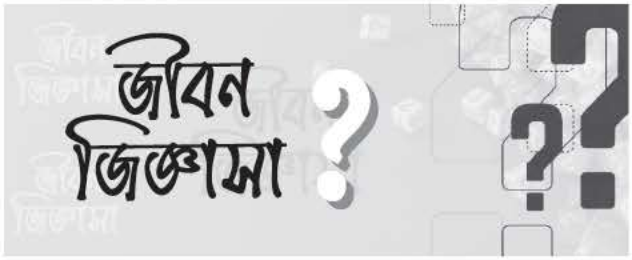

জবাব দিচ্ছেন-
মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার
প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার
মিশিগান, আমেরিকা।

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ

ফজরের ফরয নামাযের পর সুন্নাত পড়ার বিধান কি?

জবাব: ফজরের সুন্নাত নামাযের গুরুত্ব অত্যধিক। অন্যান্য সকল সুন্নাত নামাযের উপর এর মর্যাদা শরীআতের দলীল প্রমাণে সাব্যস্ত। তাই ফজরের ফরয নামাযের জামাআত শুরু হয়ে গেলেও যদি সুন্নাত আদায় করে শেষ রাকআত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে প্রতীয়মান হয় তবে ফরযের আগে সুন্নাত পড়ে নিবেন। তবে কাতার থেকে দূরে মসজিদের বারান্দায় বা কোনো কোণায় বা খুঁটির আড়ালে পড়বেন। আর ফরযের আগে পড়া সম্ভব না হলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর অভিমত অনুযায়ী উক্ত সুন্নাত সূর্যোদয়ের পর নিষিদ্ধ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে নিয়ে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময় পড়ে নেয়া যায়। তবে উক্ত সুন্নাত নামায ফরয নামায আদায়ের পরে সূর্যোদয়ের আগে আদায় করা ফিকহে হানাফীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাকরূহ। উল্লেখ্য যে, হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের ঐকমত্য অনুযায়ী ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোনো সুন্নাতের কাযার বিধান নেই। (আল মাবসূত লিস সারাখসী, আল বাদাইউস সানায়ি, আল হিদায়াহ)

ইয়াহইয়া সুজাত
গোবিন্দগঞ্জ, ছাতক, সুনামগঞ্জ

নারী, পুরুষ, শিশু কয়েকজনের জানাযা একত্রে আদায় করলে কিভাবে নিয়ত করতে হবে? জানালে উপকৃত হব।

জবাব: একত্রে নারী, পুরুষ ও শিশুর জানাযা আদায়কালে নিয়তের মধ্যে বাংলা, আরবী সহ যে কোনো ভাষায় সকলের কথা সংক্ষেপে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ত করা যাবে। যেমন বাংলা ভাষায় নিয়ত করলে: "এ সকল মায়্যিতের জানাযা আদায়ের নিয়ত করছি" এবং আরবী ভাষায় নিয়তের বাক্যে এভাবে বলা যাবে: نويت ان اودى صلاة الجنازة لهولاء الاموات

"নাওয়াইতু আন উআদ্দিয়া সালাতাল জানাযাতি লিহাউলাইল আমওয়াতি" বা অনুরূপ অর্থ প্রকাশক যে কোনো বাক্য ব্যবহার শুদ্ধ হবে।

উল্লেখ্য যে, মুখে নিয়ত উচ্চারণ না করে কেবল অন্তরে নিয়তের বিষয়বস্তু স্মরণ করে নামায আদায় করা শুদ্ধ রয়েছে। তবে নিয়তের মৌখিক উচ্চারণ মুস্তাহাব বা উত্তম।

বদরুল ইসলাম
নোয়াগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

১। জামাআতের সাথে নামায আদায়কালে মুক্তাদী ইমামের পিছনে সূরা বা কিরাত পড়তে পারবে কি? মুক্তাদী যদি নামাযে মনোযোগ রক্ষার জন্যে ইমামের সাথে সূরা বা কিরাত পাঠ করেন তাহলে সেটা শরীআতের দৃষ্টিতে জায়িয হবে কি? জানতে চাই।

২। ইউরোপ-আমেরিকায় বসবাসকারী নারী-পুরুষের কেউ কেউ চুক্তির ভিত্তিতে রক্ত সম্পর্কের ভাই কিংবা দূর সম্পর্কের ভাইকে স্বামী এবং বোনকে স্ত্রী হিসেবে তাদের নিকট অভিবাসন করান। শরীআতের দৃষ্টিতে তা জায়িয কিনা? জানতে চাই।

জবাব-১: ইমামের পিছনে জামাআতে নামায আদায়ে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা বা কিরাতের কিছুই না পড়ে চুপ থাকবে। এমতাবস্থায় ইমামের কিরাত মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: সহীহ মুসলিম, সুনানে আবী দাউদ, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনে মাজাহসহ বহু হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয় ইমাম বানানো হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য। তাই যখন ইমাম তাকবীর বলবেন তখন তোমরাও তাকবীর বল। আর যখন তিনি কিরাত পড়বেন তখন তোমরা চুপ থাক।"

পবিত্র কুরআন মাজীদে নামাযে ইমামের কুরআন তিলাওয়াতকালে মুক্তাদী চুপ করে তা শ্রবণ করার নির্দেশ এসেছে। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (الاعراف:٢٠٤)

-যখন (নামাযে) কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক। নিশ্চয় এতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে।" (সূরা আরাফ, আয়াত-২০৪)

উক্ত আয়াত অবতরণের প্রেক্ষাপট বিষয়ে অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত হলো আয়াতখানা নামাযে মুক্তাদীগণ চুপ থেকে মনোযোগ সহকারে ইমামের কিরাত শ্রবণ করার বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। (তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে বাগাবী, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে ইবনে কাসীর)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) উপরোক্ত দলীলের ভিত্তিতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা ও কিরাত না পড়াকে সুন্নাত বলে রায় দিয়েছেন। তাই মুক্তাদী ইমামের পিছনে জামাআতে নামায আদায়কালে সূরা ফাতিহা কিংবা কিরাত পড়া সুন্নাতের পরিপন্থী হিসেবে হানাফী মাযহাব মতে মাকরূহ হবে। চাই একাগ্রতা কিংবা অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যেই তা পড়ুক না কেন।

জবাব-২: বর্ণিত বিষয় মিথ্যাচার ও ধোঁকা-প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে ইসলামে এমনটা করা সম্পূর্ণ হারাম। পবিত্র কুরআন মাজীদের অনেক স্থানে মিথ্যাচারকে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করে মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর অসন্তোষ ও অভিশাপের কথা ঘোষিত হয়েছে। যেমন:

ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون (البقرة:١٠)

-আর মিথ্যাচারের কারণে তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (বাকারা, আয়াত-১০)

إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون (النحل: ١٠٥)

-আর নিশ্চয় তারাই মিথ্যা রচনা করে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস রাখে না, বস্তুত তাঁরাই মিথ্যাবাদী। (আন নাহল, আয়াত-১০৫)

হাদীস শরীফের বহু বর্ণনায় মিথ্যাচার ও ধোঁকা গোনাহে কবীরাহ ও হারাম ঘোষিত হয়েছে। যেমন:

সহীহ মুসলিম ও সুনানে তিরমিযীসহ বহু হাদীস গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা মিথ্যা কথা পরিহার কর, কেননা মিথ্যা কথা গোনাহসমূহে লিপ্ত করায় এবং গোনাহ জাহান্নামে পৌছিয়ে দেয়। মানুষ সর্বদা মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হলে অবশেষে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবে তার

নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। (বুখারী, বাবু কাওলিল্লাহ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ليس منا من غش "যে প্রতারণা করল সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (সুনানে আবী দাউদ, বাবুন নাহয়ি আনিল গাশ)

উল্লেখ্য যে, মুখে মিথ্যা বলা এবং কোনো মিথ্যা তথ্যে লিখিত ভাবে পরিবেশন করা হারাম হওয়ার দিক থেকে একই পর্যায়ভুক্ত।

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল

আলিম ২য় বর্ষ, সৎপুর কামিল মাদরাসা

জানাযা (লাশের খাট) বহনের ক্ষেত্রে ১০ কদম করে ৪০ কদম হাঁটার বিধান জানতে চাই।

জবাব: হাদীস শরীফের বর্ণনায় এর ফযীলত সাব্যস্ত রয়েছে। তাই ফুকাহায়ে কিরামের কেউ কেউ একে সুন্নাত বলেছেন। আবার কেউ কেউ একে মুস্তাহাব বলেছেন। (আল মাবসূত লিস সারাখসী, রদ্দুল মুহতার, আল বাদাইউস সানায়ি)

আব্দুল লতিফ

ছড়ারপার, বর্ষিজোড়া, মৌলভীবাজার

১। মৃতের স্মরণে ৪ দিনের কিংবা ৪০ দিনের প্রচলিত অনুষ্ঠান শরীআতের দৃষ্টিতে বৈধ কি না জানতে চাই।

২। আমাদের সমাজে প্রচলিত প্রথা যেমন: সকালে কোনো কিছু নগদ মূল্যে বিক্রয় করার আগে বাকি দেওয়া যাবে না, সন্ধ্যায় বাকি দেওয়া যাবে না, রাতে গাছ থেকে পাতা আনতে গাছের অনুমতি নিতে হবে ইত্যাদি– এ সকল কথা ও কাজ শরীআতের দৃষ্টিতে কতটুকু সঠিক?

জবাব-১: মৃতের স্মরণে সাওয়াব রেসানীর জন্য যে কোনো নেক কাজ করে এর সাওয়াব রেসানী করা সব সময় বৈধ। আবশ্যকীয় মনে করে কোনো দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা নাজায়িয। আবশ্যক মনে করা ব্যতীত কেবল ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে মৃতের সাওয়াব রেসানী (ঈসালে সাওয়াব) সহ যে কোনো বৈধ অনুষ্ঠান কোনো তারিখ নির্ধারণ করে আয়োজন শরীআতে জায়িয। তাই প্রচলিত ৪র্থ দিনের কিংবা ৪০ তম দিনের আয়োজন ঐ দিন-তারিখে না করলে হবে না এমন মনে করে করা বিদআত। এক্ষেত্রে আয়োজনকারীর নিয়ত বা উদ্দেশ্যের উপর বিষয়টির জায়িয বা নাজায়িয হওয়া নির্ভর করবে। যদি কেউ জনসমাগমের সুবিধার্থে ৪র্থ দিন বা ৪০ তম দিন বা অন্য যে কোনো দিনকে নির্দিষ্ট করে এবং সে এ ধারণা পোষণ করে, যে কোনো দিন এরূপ আয়োজন করা জায়িয রয়েছে, তাহলে তার সে আয়োজন বৈধ হবে। উল্লেখ্য যে, মৃতের ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে লোকজনকে সাধ্যমতো খাবার খাওয়ানো বৈধ। কিন্তু এটি শরীআতে আবশ্যকীয় কোনো বিষয় নয়। লোক-লজ্জার ভয়ে দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের খাবারের আয়োজন করা অনুচিত।

জবাব-২: বর্ণিত কথাগুলো প্রচলিত কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। বরং প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্য সরাসরি ইসলামী আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা নগদ ক্রয় করতে অসমর্থ কাউকে বাকি দেওয়া তার প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পার শামিল। ইসলাম এমন বিষয়ে সর্বদা উৎসাহিত করেছে। তাই কথাগুলো বাকি না দেওয়ার জন্যে ব্যবহৃত কৌশলগত বাহানা ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাছাড়া গাছের পাতা বা ফল সংগ্রহের ক্ষেত্রে দিনের বেলা যেমন তা সংগ্রহ করা জায়িয, কোনো প্রয়োজনে রাতেও তা সংগ্রহ করতে শরীআতে কোনো বাধা নেই। নিজে মালিক হলে কারো অনুমতি নেয়ারতো কোনো প্রয়োজন নেই। তবে অন্যের মালিকানাধীন হলে দিবা-রাত্র সর্বদা প্রকৃত মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে তা সংগ্রহ করা জরুরী। কোনো ইমানদারের জন্যে এসকল কুসংস্কারমূলক বিষয়ের কোনোটি আমলে নেয়া উচিত নয়। কারো মনে এসকল বিষয়ে কোনো দুর্বলতা থাকলে এগুলোর বিপরীত আমল করবে এবং তৎসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে:

اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا حول ولا قوة الا بالله

-হে আল্লাহ! তুমি অকল্যাণ সৃষ্টি না করলে কোনো কিছুতে অশুভ ফলাফলের আশংকা নেই, তদ্রুপ কোনো কল্যাণও নেই তোমার কল্যাণ ছাড়া। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো মন্দ থেকে বাঁচবার এবং কোনো ভালো কাজ করার কারো কোনো সাধ্য নেই।

কোনো কোনো বর্ণনায় উক্ত দুআর শেষাংশে শব্দগত ভিন্নতা রয়েছে। এ হাদীসটি আল মু'জামুল কাবীর ও মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহসহ বিভিন্ন কিতাবে এসেছে)

সুয়েব আহমদ

শিক্ষক, আলহাজ্ব অছিয়ত আলী করিমুন্নেছা হাফিজিয়া দাখিল মাদরাসা, সিলেট

মসজিদের মাইকে সরকারি টিকা বা হারানো বিজ্ঞপ্তি দেওয়া জায়িয আছে কি?

জবাব: মসজিদের মাইকে নামাযের আযান, ওয়ায নসীহত কিংবা মসজিদ সংশ্লিষ্ট দ্বীনী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত। তাই এর বাইরে অন্য কোনো ঘোষণা মসজিদের আদব পরিপন্থী ও মসজিদের মাইকের অপব্যবহারের শামিল। কেননা মসজিদে বসে হারানো বিজ্ঞপ্তিসহ নিছক দুনিয়াবী কথা পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর দলীল-প্রমাণে নিষিদ্ধ। তাই বর্ণিত সরকারি টিকা দানের ঘোষণা কিংবা হারানো মালের ঘোষণা মসজিদের মাইকে নাজায়িয।

পবিত্র কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا (الجن: ١٨)

-আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহর (উপাসনার) জন্যেই নির্মিত। তাই তোমরা তার সাথে অন্য কাউকে ডাকবে না।" (সূরা জিন, আয়াত-১৮)

তাছাড়া সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস শরীফে এসেছে-

عن ابي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا

-হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে শুনবে সে যেন বলে, আল্লাহ তোমার হারানো মাল যেন ফিরিয়ে না দেন। কেননা মসজিদ এজন্যে নির্মিত হয়নি। (মুসলিম, বাবুন নাহয়ি আন নাশদিদ দ্বাল্লাতি ফিল মাসজিদ)

আহমদ জামি

অনার্স প্রথম বর্ষ, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা

ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন মাজীদ খতম পড়ে বিনিময় গ্রহণ শরীআতের দৃষ্টিতে কি জায়িয?

জবাব: ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন মজীদ খতম করে বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়িয নয়। অবশ্য খতম শেষে তিলাওয়াতকারীর চাহিদা বা দাবি ব্যতিরেকে যদি কোনো হাদিয়া মায়্যিতের (বালিগ) ওয়ারিশগণের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয় তবে তা গ্রহণ জায়িয।

আব্দুল্লাহ

মিশিগান, আমেরিকা

আমার এক ছেলে রাগের বশবর্তী হয়ে হালাল খাদ্যের কোনো একটি আর কোনো দিন খাবে না বলে কসম (শপথ) করে ফেলেছে। তার করণীয় কী? জানতে চাই।

জবাব: যেকোনো হালাল বিষয় শপথ করে নিজের জন্য নিষিদ্ধ করলে শরীআতের নিয়মানুযায়ী তা ভঙ্গ করা অপরিহার্য এবং এক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গের কাফফারার যে কোনোটি আদায় করা কর্তব্য।

পবিত্র কুরআন মাজীদের সূরা মায়িদার ৮৯ নং আয়াতে কাফফারার বিস্তারিত বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। তিনটি বিষয়ের যেকোনো একটি করার মাধ্যমে এ কাফফারা আদায় করতে হবে। যথা: ১. দশজন দরিদ্রকে মধ্যম শ্রেণির খাদ্য সকাল-বিকাল দুবেলা খাওয়াতে হবে কিংবা ২. দশজন দরিদ্রকে 'সতর ঢাকা' পরিমাণ পোশাক দিতে হবে (যেমন: একটি লুঙ্গি বা পায়জামা কিংবা লম্বা কোর্তা দিতে হবে) অথবা ৩. কোনো গোলাম মুক্ত করতে হবে। খাদ্য খাওয়ানোর পরিবর্তে খাদ্য দান করলেও চলবে। তাতে প্রত্যেক দরিদ্রকে একটি ফিতরা পরিমাণ (তথা ১৭৫০ গ্রাম গম বা আটার মূল্য) দিতে হবে।

উপরে বর্ণিত তিনটির কোনো একটি দিতে সমর্থ না হলে লাগাতার তিনটি রোযা রাখতে হবে। (রদ্দুল মুহতার, হিদায়াহ)

মাহবুবুর রহমান

শরীফগঞ্জ বাজার, জকিগঞ্জ, সিলেট

ধর্মীয় কোনো প্রতিষ্ঠানে অমুসলিম বা বিধর্মী লোকের দান গ্রহণ করা কিংবা ব্যবহার করা যাবে কি?

জবাব: ফুকাহায়ে কিরামের অধিকাংশের মতে বিধর্মীদের দান মসজিদ সহ মুসলমানদের যে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগানো যাবে, যদি দানকারী প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হয়, দানের অর্থের বা সম্পদের বৈধ মালিক হয় এবং উক্ত দানের কারণে ভবিষ্যতে ধর্মীয় কোনো বিষয়ে কিংবা সে প্রতিষ্ঠান বিষয়ে তার কোনোরূপ হস্তক্ষেপের কিংবা বল প্রয়োগের আশঙ্কা না থাকে। উপরোক্ত অভিমত প্রদানে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ মনিষীগণ নিম্ন বর্ণিত তিনটি বিষয় বিবেচনায় নিয়েছেন। যথা:

১। রাসূল ﷺ নিজের ক্ষেত্রে বিধর্মীদের দান গ্রহণ করেছেন মর্মে বহু হাদীসের বর্ণনা রয়েছে। ইমাম বুখারী (র.) সহীহ বুখারী গ্রন্থে এ মর্মে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ প্রণয়ন করে নামকরণ করেছেন- **باب قبول الهدية من المشركين**- মুশরিকদের দান গ্রহণ প্রসঙ্গে পরিচ্ছেদ। তৎসঙ্গে এর বৈধতার কয়েকখানা হাদীস উল্লেখ করেছেন। যথা:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها (الخ)

-হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈকা ইহুদী মহিলা নবী ﷺ এর নিকট বিষ মিশ্রিত পাকানো বকরী নিয়ে এসেছিল। তিনি তা থেকে খেলেন। (বুখারী, মুসলিম)

২। তাদের দান গ্রহণ তাদের সাথে সদাচারের অন্তর্ভুক্ত, যা শরীআতের নির্দেশনার বাস্তবায়নও বটে।

৩। উক্ত অর্থের দ্বারা অমুসলিম লোক অন্য যে সকল পাপাচার কিংবা হারাম কার্য করার আশঙ্কা ছিল ধর্মীয় কাজে ব্যয় করার কারণে তা না করারও নিশ্চয়তা রয়েছে।

সুতরাং অমুসলিমদের দান উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণ করা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের যে কোনো কাজে লাগানো যাবে।

গয়াছ আলী সিরাজপুরী

দোয়ারা বাজার, সুমামগঞ্জ

অনিচ্ছায় কারো শরীরে পা লেগে গেলে তাকে কি কদমবুছি করতে হবে বা গায়ে হাত লাগিয়ে চুমু খেতে হবে? এ বিষয়ে শরীআত কি বলে? জানতে চাই।

জবাব: শিষ্টাচার বা আদব প্রদর্শণের ক্ষেত্রে স্থান বিশেষে বিভিন্ন রীতি প্রচলিত আছে যেগুলো অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। আবার আচার-আচরণের মধ্যে এক স্থানে যা স্বাভাবিক তা অন্য স্থানে শিষ্টাচার পরিপন্থী হিসেবেও পরিগণিত হতে পারে। তাই সে সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানের প্রচলিত নিয়মাবলি সরাসরি শরীআত পরিপন্থী না হলে তা গ্রহণযোগ্য। উসূলবিদগণের প্রণীত মূলনীতিতে রয়েছে: **العادة محكمة**। অর্থাৎ, প্রচলিত রীতি-নীতি ফয়সালাযোগ্য বিধানভুক্ত। এর স্বপক্ষে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর বক্তব্য হলো-

ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح

-মুমিনগণ যা উত্তম মনে করে তা আল্লাহর নিকট উত্তম এবং মুমিনগণ যা মন্দ মনে করে তা আল্লাহর নিকট মন্দ"। (আল মুজামুল কবীর)

তাই এর আলোকে আমাদের দেশীয় আচরণে কারো গায়ে পা লাগলে বেয়াদবি হয়েছে বিবেচনায় তখন ঐ ব্যক্তির গায়ে আদবের সাথে হাত স্পর্শ করে সে হাতে চুমু খাওয়ার প্রথা উত্তম শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত। এটি শরীআত বিরুদ্ধ নয়। তবে কোনো এলাকায় এরকম প্রচলন না থাকলে সেখানে তা প্রযোজ্য নয়।

আফিয়াউল হুসনা

শান্তির বাজার, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার করণীয় কী? সন্তানের হক আদায়ে পিতা মাতা বৈষম্য করলে কোনো গোনাহ হবে কি?

জবাব: সন্তানের উপর মা বাবার যেমন হক বা অধিকার রয়েছে। তেমনিভাবে সন্তানের জন্য মা বাবারও অনেক করণীয় রয়েছে। যেমন- সন্তানের জন্ম পরবর্তী সপ্তম দিবসে আকীকাহ করা, সুন্দর নাম রাখা, দ্বীনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া, শিষ্টাচার শিখানো, প্রাপ্ত বয়স্ক ও কর্মক্ষম হওয়া পর্যন্ত ভরণ পোষণ চালিয়ে নেওয়া, উপযুক্ত ও পরিবার চালানোর সামর্থবান হলে বিবাহ দেওয়া এবং একাধিক সন্তান থাকলে তাদেরকে সমান চোখে দেখা ইত্যাদি। রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত করেছেন। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে,

عن عامر، أن النعمان بن بشير حدثه، أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا، قال: فأشهد غيري، ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذا.

-নু'মান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তার পিতা তাকে বহন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি নু'মানকে এই জিনিস দান করেছি। তিনি বললেন, তোমার সব সন্তানকে কি দান করেছ? তিনি বললেন, না। তিনি বলেন, তাহলে আমি ভিন্ন অন্যকে সাক্ষী রাখো। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কি কামনা করো না যে, তোমার সকল সন্তান তোমার সাথে সমানভাবে সদ্ব্যবহার করুক? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে এরূপ করো না। (আল আদাবুল মুফরাদ, বাবু আদাবিল ওয়ালিদি ওয়া বিররিহি লিওয়ালাদিহ)

এই হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, রাসূল ﷺ সকল সন্তানের হক সমানভাবে আদায় করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা সন্তান হিসেবে সকলেই পিতা-মাতার কাছে সমান।

সন্তানের হক অনাদায়ে পিতা মাতাকেও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। নিম্নবর্ণিত হাদীসে এর ইঙ্গিত রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি,

كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته (الخ)

-তোমাদের প্রত্যেকেই (সুনির্দিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত) তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেকেই নিজের তত্ত্বাবধান বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম বা নেতা একজন (উচ্চ পর্যায়ের) তত্ত্বাবধায়ক। তিনি তার তত্ত্বাবধান বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন। অনুরূপ পুরুষ তার পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক, সেও তার তত্ত্বাবধান বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। (বুখারী)

কামরান আহমদ
বিশ্বনাথ, সিলেট

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পিতা কি মুশরিক ছিলেন? বিস্তারিত জানতে চাই।

জবাব: হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পিতা কে ছিলেন এ সম্পর্কে মনিষীগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে মোট তিনটি মত বর্ণিত হয়েছে। যথা:

(ক) তাঁর পিতার নাম তারুহ বা তারুখ ছিল, যিনি একত্ববাদে বিশ্বাসী ঈমানদার ছিলেন। আর আযর মূলত: তার চাচা ছিলেন যিনি পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত অভিভাবক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন।

(খ) তাঁর পিতার নাম আযর, যিনি মুশরিক ছিলেন।

(গ) তাঁর পিতার প্রকৃত নাম তারুহ ছিল। আযর ঐ তারুহের উপাধি ছিল। অর্থাৎ আযর ও তারুহ একই ব্যক্তি ছিলেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিমত অনুযায়ী হযরত ইবরাহীম (আ.) এর পিতা ঈমানদার ছিলেন না। এ মতের পক্ষে কিছু মনীষী রয়েছেন, যারা কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিংবা বিরোধপূর্ণ বর্ণনাসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ব্যতীত কুরআন মাজীদের আয়াত ও হাদীস শরীফের কতিপয় বর্ণনার আলোকে উক্ত রায় দিয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে অধিক বিবেচনাযোগ্য ও অধিক বিশ্লেষণপ্রসূত অভিমত হচ্ছে প্রথম অভিমত। সে অনুযায়ী হযরত ইবরাহীম (আ.) এর পিতা ঈমানদার ছিলেন।

হাদীস শরীফের বহু বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পূর্ব-পুরুষগণের সকলেই ঈমানদার ও স্বীয় যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নূর মুবারক স্থানান্তর হওয়ার বর্ণনা সম্বলিত রেওয়ায়েতে রয়েছে- তাঁর পূর্ব-পুরুষগণের সকলে আল্লাহর উপাসনাকারী ঈমানদার ছিলেন। আর যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন সর্বসম্মত মতানুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পূর্ব পুরুষ। তাই তাঁর পূর্ব-পুরুষগণের সকলে ঈমানদার না হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর পূর্ব-পুরুষগণের সকলের ঈমানদার সাব্যস্ত হওয়ার বিষয় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তাছাড়া হযরত ইবরাহীম (আ.) কে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নিষেধ করা হয়েছিল অথচ তিনি শেষ জীবনে পিতার মাগফিরাত কামনা করেছিলেন বলে পবিত্র কুরআন মাজীদে প্রমাণ রয়েছে। তাই তাঁর পিতা মুশরিক হলে কিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন? এসকল বিষয়াবলি সমাধানকল্পে মনীষীগণের অনেকে প্রথম অভিমতকে অধিক গ্রহণযোগ্য হিসেবে রায় প্রদান করেছেন।

প্রথম অভিমতের পক্ষে যে দলীল প্রদান করা হয় যে, পবিত্র কুরআন মাজীদে এসেছে,

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين (الانعام:٧٤)

-স্মরণ করুন! যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা আযরকে বললেন, আপনি কি মূর্তিসমূহকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছেন? নিশ্চয় আমি আপনাকে এবং আপনার সম্প্রদায়কে প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত দেখছি। (সূরা আনআম, আয়াত-৭৪)

উল্লেখিত আযর দ্বারা এখানে পিতা নয় বরং চাচাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা আরবী ভাষায় اب শব্দের প্রয়োগ পিতা ও চাচা উভয় অর্থে হওয়া সাব্যস্ত রয়েছে। কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তদীয় 'তাফসীরে মাযহারীর' ৩য় খণ্ডের ২৮০-২৮১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন,

و كان آزر على الصحيح عما لإبراهيم ع و العرب يطلقون الأب على العم. و الزرقاني في الشرح المواهب أن دليل كون آزر عما لإبراهيم ع قد صرح به الشهاب الهيثمي بأن أهل الكتابيين و التاريخ أجمعوا أن آزر عم إبراهيم ع .

-বিশুদ্ধ মতানুযায়ী আযর ইবরাহীম (আ.) এর চাচা ছিলেন আর আরববাসীগণ عم (চাচা) অর্থে أب (পিতা) ব্যবহার করে থাকে। ইমাম যুরকানী (র.) 'শরহে মাওয়াহিব, গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আযর ইবরাহীম (আ.) এর চাচা হওয়ার দলীল হিসেবে শিহাব হায়সামী বলেছেন, আহলে কিতাব এবং ঐতিহাসিকগণ একমত হয়েছেন যে, আযর ইবরাহীম (আ.) এর চাচার নাম।

তাফসীরে মাযহারীর ৫ম খণ্ডের ১৪৩ নং পৃষ্ঠায় পানিপথী (র.) **ربنا اغفرلي و لوالدي** এর তাফসীরে লিখেছেন,

هذه الآية تدل على أن والديه كان مسلمين و إنما كان آزر عما له و كان اسم أبي إبراهيم ع تارخ كما ذكرنا في سورة البقرة و لأجل دفع توهم آزر قال والدي يعني من ولدني حقيقة و لم يقل أبوي فإن الأب يطلق على العم مجازا .

অর্থাৎ এ আয়াত প্রমাণ করে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) এর মাতা-পিতা মুসলমান ছিলেন এবং আযর তাঁর চাচা। ইবরাহীম (আ.) এর পিতার নাম ছিল তারুখ, যেমন সূরা বাকারায় এতদসংক্রান্ত আলোচনায় আমি উল্লেখ করেছি এবং আযর পিতা হওয়ার সন্দেহ দূর করার জন্য ইবরাহীম (আ.) এখানে **أبوي** না বলে **والدي** বলেছেন, যিনি তাঁর প্রকৃত জন্মদাতা পিতা। কেননা **الأب** শব্দটি রূপকভাবে চাচা অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

তাফসীরে তাবারী ৫ম খণ্ডের ১৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে,

حدثنا محمد بن حميد و سفيان بن وكيع قالا حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال ليس آزر أبا إبراهيم.

-মুহাম্মদ ইবনু হুমাইদ ও সুফিয়ান ইবনু ওয়াকী বলেছেন, জারীর বর্ণনা করেছেন লাইস থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন মুজাহিদ থেকে, হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, আযর ইবরাহীম (আ.) এর পিতা নন।

حاشيه جمل على الجلالين এর ৫ম খণ্ডের ৪১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

و آزر كان عم إبراهيم ع .

অনুবাদ: আযর ইবরাহীম (আ.) এর চাচা ছিলেন।

দ্বিয়াউল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৮-২৫৯ এর মধ্যে আছে

لأبيه سے مراد آزر ہے جو آپ کا چچا تھا ۔ آپکے والد کا نام تارخ تھا ۔

-কুরআন শরীফে **لأبيه** দ্বারা আযর বুঝানো হয়েছে, যিনি হযরত ইবরাহীম (আ.) এর চাচা ছিলেন। ইবরাহীম (আ.) এর পিতার নাম তারুখ ছিল।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) আযর ইবরাহীম (আ.) এর চাচা হওয়ার পক্ষে অনেক দলীল উপস্থাপন করেছেন। যেমন তিনি বর্ণনা করেছেন:

أخرج ابن المنذر بسند صحيح عن جريج في قوله تعالى و إذ قال إبراهيم

لأبيه آزر قال ليس آزر بأبيه إنما هو إبراهيم بن تارح أو تارخ بن شارخ بن ناخر بن فالخ .

-এর তাফসীরে ইবনু মুনযির বিশুদ্ধ সনদে و إذ قال إبراهيم لأبيه آزر জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেছেন জুরাইজ বলেন, আযর ইবরাহীম (আ.) এর পিতা নয়, তিনি হলেন ইবরাহীম ইবনু তারুহ বা তারুখ ইবনু শারুখ ইবনে নাখুর ইবনে ফালুখ।

তিনি আরো বর্ণনা করেছেন,

أخرج ابن أبي حاشم بسند صحيح عن السدي أنه قيل له اسم أبي إبراهيم آزر فقال بل اسمه تارح .

-ইবনু আবী হাশিম বিশুদ্ধ সনদে সুদ্দী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সুদ্দীকে বলা হলো হযরত ইবরাহীম (আ.) এর পিতার নাম ছিল আযর, তদুত্তরে সুদ্দী বললেন, না আযর নয়, বরং তাঁর পিতার নাম ছিল 'তারুহ'।

ইমাম সুয়ূতী (র.) আরো বলেন,

روينا بالأسانيد عن ابن عباس رضـ و مجاهد و ابن جرير و السدي أنهم قالوا ليس آزر أبا لإبراهيم عـ انما هو إبراهيم بن تارخ .

-আমি বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে হযরত ইবনু আব্বাস (রা.), মুজাহিদ (র.) ইবনু জারীর (র.) এবং সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণনা করেছি, সকলেই বলেছেন, আযর ইবরাহীম (আ.) এর পিতা নন, নিশ্চয় তিনি [ইবরাহীম (আ.)] হলেন ইবরাহীম বিন 'তারুখ'।

আরো অগণিত বর্ণনা ও দলীল বিদ্যমান আছে যে, আযর ইবরাহীম (আ.) এর পিতা নন, বরং চাচা। আল কামুসুল লুগাতে বর্ণনা করা হয়েছে: آزر اسم عم إبراهيم عـ و أما ابوه فانه تارخ .

-আযর ইবরাহীম (আ.) এর চাচার নাম, তার পিতার নাম 'তারুখ'।

নকলী-আকলী দলীল ছাড়াও আরবী অভিধানবিদগণের মতেও আযর ইবরাহীম (আ.) এর পিতা নন, বরং চাচা ছিলেন। আর ইবরাহীম (আ.) এর পিতা তারুখ ঈমানদার ছিলেন।

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ঢাকা

রাসূলুল্লাহ (সা.) কি নূরের সৃষ্টি? নূরের হলে সে নূর সত্তাগত নাকি হিদায়াতের? বিষয়টি কি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার অন্তর্ভুক্ত? জানতে চাই।

জবাব: রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মহান আল্লাহ তাআলা 'নূর' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين

-নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নূর বা স্পষ্ট কিতাব এসেছে। (সূরা মায়িদা, আয়াত-১৫)

অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কিরামের মতে এ আয়াতে বর্ণিত নূর হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। যেমন- তাফসীরে তাবারীতে এসেছে,

"من الله نور"، يعني بالنور، محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق

من الله نور এ আয়াতে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা সত্যকে আলোকিত করেছেন। (তাফসীরে তাবারী, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৩)

হাদীস শরীফে রাসূল ﷺ তাঁর নূরকে আল্লাহর সর্বপ্রথম সৃষ্টি বলে ঘোষণা করেছেন। আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ কিতাবে ইমাম কস্তল্লানী এ সম্পর্কে হাদীস উল্লেখ করে রাসূল ﷺ এর নূর যে আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি তা প্রমাণ করেছেন। যেমন তিনি লিখেছেন,

وروى عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: قلت يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أخبرنى عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى، ولم يكن فى ذلك الوقت لوح ولا قلم، ولا جنة ولا نار، ولا ملك ولا سماء، ولا أرض ولا شمس ولا قمر، ولا جنى ولا أنسى، فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول القلم، ومن الثانى اللوح، ومن الثالث العرش. ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول حملة العرش، ومن الثانى الكرسى، ومن الثالث باقى الملائكة، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول السماوات، ومن الثانى الأرضين ومن الثالث الجنة والنار – (الخ)

-আব্দুর রাজ্জাক তাঁর সনদসহ হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আমাকে এই খবর দিন যে, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম কোন বস্তু সৃষ্টি করেছেন? প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, হে জাবির! আল্লাহ পাক সব কিছুর পূর্বে তোমার নবীর নূরকে তাঁর নূর থেকে (অর্থাৎ নিজের নূরের ফয়েয দ্বারা) সৃষ্টি করেছেন। সেই নূর আল্লাহ পাকের কুদরতে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ভ্রমণরত ছিল; আর সে সময় লওহ, কলম, বেহেশত, দুযখ কিছুই ছিল না, ফেরেশতাও ছিল না, এমনকি আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, জিন ও মানব এক কথায় কিছুই ছিল না। অতঃপর যখন আল্লাহ পাক বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন, তখন সেই নূরকে চারভাগে বিভক্ত করেন। একভাগ দ্বারা কলম সৃষ্টি করলেন, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা লাওহ, আর তৃতীয় ভাগ দ্বারা আরশ সৃষ্টি করেন। (এরপর সুদীর্ঘ হাদীস রয়েছে)। (আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ, আল জুযউল মাফকূদ মিনাল মুছান্নাফ)

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) লিখেছেন, এই হাদীস দ্বারা এই কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, নূরে মুহাম্মদী হলো আল্লাহ পাকের সর্বপ্রথম সৃষ্টি। কেননা যেসব জিনিসের ব্যাপারে প্রথমে সৃষ্টি হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়, সেই সবগুলোর সৃষ্টি যে নূরে মুহাম্মদীর পর, তা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং প্রতিভাত হয়। (নাশরুত তীব)

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ হিদায়াতের নূর হওয়া মেনে নেওয়াতে কোনো বৈপরিত্যের কারণ নেই। কেননা ঐ নূরকে মাজাযী বা রূপকার্থে হিদায়াতের আলো হিসেবে কেউ কেউ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেখানে হাকীকী অর্থে নূর হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান সেখানে হাকীকত পরিহার করে কেবল মাজাযী তথা রূপক অর্থে বিশ্লেষণ অসমীচীন। অবশ্য এরূপ বিশ্বাস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আবশ্যকীয় কোনো আকীদার অন্তর্ভুক্ত নয়। যে কারণে আকীদার কিতাবসমূহে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়নি। সর্বোপরি বিষয়টি জটিল এবং সর্বসাধারণের বোধগম্য নয়। এর জটিলতা নিরসনে বিশুদ্ধ আকীদাপন্থী গভীর জ্ঞানের অধিকারী হক্কানী আলিমগণের শরণাপন্ন হওয়ার বিকল্প নেই। রাসূল ﷺ কে আল্লাহ প্রদত্ত সকল গুণাবলি ও মর্যাদাসহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল মেনে নেয়াই বিশুদ্ধ আকীদা পোষণের সহজ পথ।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর যাত বা সত্তার অংশ নন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আল্লাহর অংশ মনে করা শিরক।

অভ্যন্তরীণ

মুজিববর্ষে ঘর পেলেন ৬৬ হাজার গৃহহীন পরিবার

মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে ১ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সারা দেশে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ভূমিসহ আধা পাকা ঘর দিল সরকার। 'মুজিববর্ষে কেউ গৃহহীন থাকবে না'- এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আশ্রায়ন-২ প্রকল্পের অধীনে চলমান কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে এসব ঘর হস্তান্তর করা হয়। ইতোমধ্যে ২১ জেলার ৩৬ উপজেলায় ৪৪টি গ্রামে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। উপকারভোগী প্রতিটি পরিবারকে ২ শতক জমির রেজিস্ট্রি মালিকানা দলিল হস্তান্তরসহ নতুন খতিয়ান ও সনদ হস্তান্তর করা হয়। প্রতিটি জমি ও বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি দুই রুমের সেমি পাকা টিনশেড বাড়িতে রান্নাঘর, টয়লেট, বারান্দাসহ বিদ্যুৎ ও পানির নাগরিক সুবিধা রয়েছে। চলতি মাসে গৃহহীনদের মাঝে আরও প্রায় ১ লাখ গৃহ বিতরণ করা হবে। সারা দেশের ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ তালিকা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ ও পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলবে।

পদোন্নতি চালু হচ্ছে প্রাথমিকে

প্রাথমিক শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। শিক্ষা অফিসার থেকে পরিচালক পর্যন্ত পদোন্নতি পাবেন প্রাথমিক শিক্ষকরা। এ ব্যাপারে নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন চূড়ান্তপর্যায়ে রয়েছে, এখন শুধু অনুমোদনের অপেক্ষায়। অনলাইন পদ্ধতিতে শিক্ষকদের বদলির প্রক্রিয়া চলমান, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের গেজেটেড অফিসার ও নন-গেজেটেড কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮৫-এর অধীনে প্রধান শিক্ষকদের পদোন্নতির বিধান ছিল। প্রধান শিক্ষকরা সহকারী উপজেলা-থানা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদে পদোন্নতি পেতেন। এতে সহকারী শিক্ষকরাও নির্দিষ্ট সময়ে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির সুযোগ পেতেন। সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টির কার্যক্রম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন। প্রধান শিক্ষকের বেতন স্কেল ১১ এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল ১৩ গ্রেডে উন্নীত করা হয়েছে।

ভারতীয় পেঁয়াজে ক্রেতাদের আগ্রহ নেই

টানা সাড়ে তিন মাস বন্ধের পর এখন দেশের ভরা মৌসুমে আসছে ভারতীয় পেঁয়াজ। এতে কৃষকদের কপালে চিন্তার ভাজ দেখা দিলেও সুখবর হচ্ছে বাজারে বিক্রি হচ্ছে না ভারতীয় পেঁয়াজ। এতে বিপাকে পড়েছেন আমদানিকারকেরা। বাজারে চাহিদা বেশি দেশি পেঁয়াজের, দামও কম। ২০২০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর করোনা পরিস্থিতির মধ্যে হঠাৎ ভারত সরকার পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দেয়। বছরের শেষের দিকে ২৯ ডিসেম্বর রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে ভারত। এরপর বছরের শুরুর দিক থেকে আবারও ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়। বাজারে এখন দেশি পেঁয়াজ পাইকারি দরে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ২৭-২৮ টাকা, খুচরা ৩০ টাকা। ভারতীয় পেঁয়াজ পাইকারি ৩৬-৩৭ টাকা, খুচরা বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকায়। তাই ক্রেতাদের আগ্রহ নেই ভারতীয় পেঁয়াজে। কেবল দাম নয় সম্প্রতি ভারতীয় পেঁয়াজের বিপক্ষে বাংলাদেশীদের এক ধরনের মনোভাব তৈরি হয়েছে। যার বহিঃপ্রকাশ বাজারে ভারতীয় পেঁয়াজের উপর ক্রেতার অনাগ্রহতা।

তেলের দাম ৯ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ

এখন সয়াবিন তেলের এক লিটারের বোতলের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৩৪ টাকা। ২০১২ সালে ১৩৫ টাকায় উঠেছিল। গত পাঁচ মাসে সয়াবিন তেলের দাম লিটার প্রতি ৩০ টাকা বাড়ল। সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) হিসাবে, এক বছর আগের তুলনায় বাজারে এখন সয়াবিনসহ ভোজ্যতেলের দাম ১৯ থেকে ২৩ শতাংশ বেশি। ভোজ্যতেলের দাম বাড়ার জন্য আন্তর্জাতিক বাজারকে দায়ী করছেন ব্যবসায়ীরা। গত ৭ জুলাই বিশ্ববাজারে এক টন অপরিশোধিত সয়াবিন তেলের দাম ছিল ৭৪৩ ডলার, যা চলতি মাসে ১ হাজার ১৭৮ ডলার ছাড়িয়েছে। তাঁদের দাবি, দেশের সয়াবিনের উৎস ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়েতে প্রতি টন অপরিশোধিত সয়াবিনের দাম ১ হাজার ১৫০ মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। দেশে বছরে প্রায় ১৫ লাখ টন ভোজ্যতেলের চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়।

টেকনাফ সৈকতে প্রাচীন মসজিদের সন্ধান

কয়েক শত বছরের প্রাচীন ও ক্ষুদ্রতম একটি মসজিদের সন্ধান মিলেছে টেকনাফে। উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের মাথাভাঙ্গা এলাকায় মেরিন ড্রাইভ সংলগ্ন সাগর পাড়ে এই মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায়। এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির দেয়াল ঘেঁষে একটি বড় মিম্বর রয়েছে। বাইরের দৈর্ঘ্য (উত্তর-দক্ষিণ) মিম্বরসহ ১৬ ফুট এবং বাইরের প্রস্থ (পূর্ব-পশ্চিম) ১২ ফুট। মসজিদটির ভেতরের দৈর্ঘ্য ৭ ফুট এবং প্রস্থ ৬ ফুট। মসজিদটির একটি মেহরাব রয়েছে এবং দেয়ালে ছোট ছোট কয়েকটি খোপ রয়েছে। মসজিদটি পোড়া ইট, বালু, চুন এবং সুরকি দিয়ে নির্মিত হয়েছে বলে ধারণা করছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কয়েকজন যুবক জঙ্গল পরিষ্কার করে মসজিদটির পুরো চিত্র বের করে আনার চেষ্টা করেন। এলাকাবাসী জানান, প্রাচীন এই মসজিদ সম্পর্কে তারা পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম শুনে আসছেন। এমনকি এটি কয়েকশ' বছর পুরনো মসজিদ বলেও বলছিলেন তারা। ধারণা করা হচ্ছে, প্রাচীন ধর্ম প্রচারকরা মসজিদটি নির্মাণ করতে পারেন।

করোনাকালে বিচারবহির্ভূত হত্যা বেড়েছে

হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি এইচআরএসএস জানিয়েছে ২০২০ সালে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে ২৪৩ জন নিহত হয়েছেন। এদের ভিতরে ক্রসফায়ারে ১৬৮ জন, নির্যাতনের শিকার হয়ে ২০ জন, গুলিবিদ্ধ হয়ে ১২ জন এবং কারা হেফাজতে মারা যান ৪৩ জন। একই সময়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে ৩৫ জনকে উঠিয়ে নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। পরবর্তী সময়ে এদের মধ্যে লাশ পাওয়া গেছে দুই জনের। গ্রেফতার দেখানো হয়েছে ১৩ জনকে এবং ১৪ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর গুলিতে ৩৪টি ঘটনায় শারীরিক নির্যাতন ও গুলি করে ৫১ জন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১৫ জন এবং গ্রেফতার হয়েছেন ৩২ জন। আইন ও সালিশ কেন্দ্র আসক জানিয়েছে, ২০২০ সালে সারাদেশে ধর্ষণ ও সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১৬২৭ নারী। এর মধ্যে ধর্ষণ পরবর্তী হত্যার শিকার হয়েছেন ৫৩ জন এবং ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছেন ১৪ জন। পারিবারিক নির্যাতনের কারণে মারা গেছেন ৩৬৭ নারী। শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যাসহ বিভিন্ন কারণে ৫৮৯ শিশু নিহত হয়েছে। বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয় ১৭১৮ শিশু। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার ১০১৮ শিশু, ধর্ষণ চেষ্টা ও যৌন হয়রানীর শিকার ২৭৯ শিশু। ২০২০ সালে বলাৎকারের শিকার হয়েছে ৫২ ছেলে শিশু, বলাৎকারের পর ৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। একই বছর সাংবাদিক নিহত হয়েছেন দুই জন। গ্রেফতার হয়েছেন ১৭ জন।

ভারতের গরু আমদানি বন্ধে সুফল পেল বাংলাদেশ

২০১৪ সালে মোদী সরকার ক্ষমতায় এসে হঠাৎ করে ভারতের গরু বাংলাদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। বিজেপি সরকারের গরু দেওয়া বন্ধের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের ভোক্তাদের সাময়িক গরুর গোশতের সংকটে ফেললেও শাপে বর হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য মতে, বাংলাদেশে এখন ২৮ লাখ পরিবার সরাসরি গবাদি পশু পালন করে থাকে। বর্তমানে দেশে গরুর সংখ্যা দুই কোটি ৩৬ লাখ এবং মহিষের সংখ্যা ১৫ লাখের বেশি। মোট গরুর ৬০ শতাংশই পালন করা হয় উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে। প্রতিটি পরিবারে একটি, দুটি থেকে ১০টি পর্যন্ত গরু প্রতিপালন করা হচ্ছে। ভারত থেকে আমদানি কমে যাওয়ায় মূলত গরুর এই প্রক্রিয়ায় প্রতিপালন বেড়েছে। অতীতে ভারতীয় গরুতে বাংলাদেশের গোশতের চাহিদা মেটানো হলেও এখন দেশের উৎপাদিত গরুতেই চাহিদা পূরণ সম্ভব হচ্ছে। একই সঙ্গে বিদেশি মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে। ফলে গবাদিপশুর সংখ্যা বৃদ্ধি সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতি, বিশেষত গ্রামীণ অর্থনীতিকে বদলে দিচ্ছে। তবে খামারীদের আশঙ্কা, কুরবানির ঈদের সময় চোরাইপথে গরুর পাল আসলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

আন্তর্জাতিক

করোনা শনাক্ত দশ কোটি ছাড়িয়েছে; মৃত্যু ২১ লাখের বেশি

বিশ্বে করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ১০ কোটি ছাড়িয়েছে। মৃত মানুষের সংখ্যা ২১ লাখেরও বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার করোনা ডাটাবেস ওয়ার্ল্ডোমিটারের গত ২৬ জানুয়ারির তথ্যমতে, এখন পর্যন্ত বিশ্বে করোনা থেকে সেরে ওঠা মানুষের সংখ্যা ৭ কোটি ২০ লাখ ৫৮ হাজার। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে মারা গেছেন ৪ লাখ ৩০ হাজার মানুষ। দ্বিতীয় অবস্থানে ভারত, মারা গেছেন ১ লাখ ৫৩ হাজার। ৩১তম অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। যা গতমাসে ছিল সাতাশের কোটায়। শনাক্তের সংখ্যা ৫ লাখ ৩২ হাজার। মৃতের সংখ্যা ৮ হাজারের বেশি। তবে রোগী শনাক্তের হার ১০ শতাংশের নিচে।

ক্যাপিটলে হামলার ঘটনায় নিন্দার ঝড়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেসের ভবন ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে জো বাইডেনকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য অধিবেশন চলছিল। এ সময় ব্যারিকেড ভেঙে ভবনের ভিতরে ঢুকে পড়েন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শত শত সমর্থক। গত ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল ভবনে রীতিমত তাণ্ডব চালান ডোনাল্ড ট্রাম্পের উগ্র সমর্থকরা। এতে এক পুলিশসহ পাঁচজন মানুষ মারা যায়। এ হামলায় বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় ওঠেছে। হামলার পর ট্রাম্পের সঙ্গ ছেড়েছেন তার ঘনিষ্ট জনেরা। নিন্দা জানিয়ে পদত্যাগ করেছেন হোয়াইট হাউসের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি সারাহ ম্যাথিউস, মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের চিফ অব স্টাফ এবং ট্রাম্পের সাবেক প্রেস সচিব স্টেফানি গ্রিসহাম। উগ্রবাদী রিপাবলিকান সমর্থকদের দিয়ে একটি অভ্যুত্থান করে ক্ষমতা ধরে রেখে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করতে চেয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স ও হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির সঠিক পদক্ষেপে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল গার্ড, পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর সহায়তায় রক্ষা পান হাউস ও সিনেট সদস্য ও আইন প্রণেতারা। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ক্যাপিটল ভবনে এটা ছিল দ্বিতীয় হামলা। প্রথম ১৮১৪ সালে ব্রিটিশ বাহিনী এ ভবনটি লুট করে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

প্রথানুযায়ী বাইবেলে হাত রেখে শপথ নিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন

গত ২০ জানুয়ারি ওয়াশিংটনে মার্কিন কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটল হিলের ওয়েস্ট ফ্রন্টে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন জো বাইডেন। ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ৪৮ মিনিটে প্রধান বিচারপতি তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। পরিবারের ১২৭ বছরের পুরোনো বাইবেলের একটি কপি হাতে শপথবাক্য পাঠ করেন বাইডেন। শপথের দিন সকালে তিনি প্রথমে যান ক্যাথেড্রাল অব সেন্ট ম্যাথিউ দ্য অ্যাপোস্টল গির্জায়। সেখানে তার সঙ্গে যোগ দেন তার দল ডেমোক্রেটিক পার্টি ও বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টির নেতারা। প্রার্থনার পর বাইডেন এক টুইটে লেখেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে নতুন এক দিনের সূচনা।' এরপর প্রথা অনুযায়ী প্রথমে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন কমলা হ্যারিস। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী, প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান ও প্রথম দক্ষিণ এশীয় হিসেবে এই পদে অধিষ্ঠিত হলেন কমলা। শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেননি বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স, সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, জর্জ ডব্লিউ বুশ ও বিল ক্লিনটন এবং সাবেক ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামা, লরা বুশ ও হিলারি ক্লিনটনসহ সামরিক, বেসামরিক শীর্ষপর্যায়ের কর্মকর্তারা।

৩০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরাঈল

গতবছর ৩০ ফিলিস্তিনিকে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করেছে ইসরাঈলী বাহিনী। ইসরাঈলের মানবাধিকার সংস্থা বি সেলেম জানিয়েছে, ২০২০ সালে ইসরাঈল নিরাপত্তা বাহিনী গাজায় ৭ জন এবং পূর্ব তীর ও জেরুজালেমে ২৩ জনকে হত্যা করেছে। পূর্ব তীরে হত্যা করা হয়েছে ১১ জনকে। পরিবার বলছে, তাদের সন্তানরা নিরস্ত্র ছিল। আল জাজিরার তথ্যমতে, করোনাকালেও ইসরাঈল ফিলিস্তিনি ৭২৯ টি বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

চীন বিশ্বের বৃহত্তম জিডিপি

বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির আসনটি হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় থেকে এক নম্বর অবস্থানে উঠে এসেছে চীন। ২০২০ সালে চীনের জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ২৯ দশমিক ৪৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপির আকার দাঁড়ায় ২২ দশমিক ৩২ ট্রিলিয়ন ডলার। নতুন বছর মানে ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপির আকার হবে ২৩ দশমিক ১৮ ট্রিলিয়ন ডলার। এ বছরে চীনা জিডিপি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩১ দশমিক ৮৫ ট্রিলিয়ন ডলার। (উল্লেখ্য, এক লাখ কোটিতে এক ট্রিলিয়ন হয়)। ১৯৮০ সালের প্রথম তালিকায় শীর্ষস্থান পায় যুক্তরাষ্ট্র। চীন তখন শীর্ষ দশেই ছিল না। তবে ১৯৯০ সালে চীন শীর্ষ দশে উঠে আসে। দীর্ঘ চার দশক পর শীর্ষ অবস্থান হারায় যুক্তরাষ্ট্র। প্রসঙ্গত, ১৯৩টি দেশের মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান এখন বিশ্বের ৪১তম।

পশ্চিমবঙ্গে ফুরফুরা পীরজাদার সঙ্গে আসাদ উদ্দিন ওয়েইসির সাক্ষাত

বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ফুরফুরা পীর সাহেবের মাযার যিয়ারতে আসেন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীনের (মিম) প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। বছরের প্রথম সপ্তাহে ফুরফুরা শরীফে পৌঁছে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির সবচেয়ে আলোচিত নাম পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকের ছবিও টুইট করেছেন ওয়েইসি। হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনের কৌশল নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি বিহার রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচনে মুসলিম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল এককভাবে পাঁচটি আসন লাভ করে। তারপরই মিম প্রধান জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেবে তার দল। তার এই বৈঠক অনেকটা মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কংগ্রেস ও তৃণমূলের। বামদল সিপিএমও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। প্রায় ৯৩ বছরের পুরনো রাজনৈতিক দল মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের প্রভাব বছর কয়েক আগেও হায়দ্রাবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তিন তালাক রদ করার বিরোধিতা থেকে শুরু করে বাবরি মসজিদ ইস্যু ও নাগরিকত্ব আইন নিয়ে ওয়েইসি যেভাবে সরব হয়েছেন, তাতে ভারতীয় মুসলিম সমাজের একটা বড় অংশ তাকে সেদেশে মুসলিমদের 'জাতীয় নেতার' ভূমিকায় দেখতে শুরু করছেন।

পাকিস্তানের সাথে প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় আগ্রহী কাতার

পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় আগ্রহ প্রকাশ করেছে কাতার। দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদার করতে দোহার আয়োজনে উভয় দেশের সামরিক বাহিনীর উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এক বিবৃতিতে কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দুই দেশের সামরিক বাহিনী প্রধান উভয় দেশের সামরিক সহযোগিতার সম্পর্ক নিয়ে পর্যালোচনা করেন। এতে উভয় দেশের সামরিক বাহিনী শক্তিশালী ও উন্নয়নের বিষয়টি স্থান পেয়েছে। চলতি মাসে দোহায় পাকিস্তান ও কাতারের বিমান বাহিনী যৌথ সামরিক মহড়া দেওয়ার কথা রয়েছে।

তুরস্ক-আজারবাইজান সামরিক মহড়া

তুরস্ক ও আজারবাইজানের সশস্ত্র বাহিনী শীতকালীন যৌথসামরিক মহড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তুরস্কের কার্স অঞ্চলে এ মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। আজারবাইজানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দুই দেশের সেনারা শীতকালীন মহড়ায় অংশ নেবেন। চলতি মাসের ১ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত এ মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। তুরস্কের সশস্ত্র বাহিনীও পৃথক বিবৃতিতে সোমবার তাদের মহড়ার প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে। তুর্কি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, গত কয়েক বছরের মধ্যে এবারই অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে এ মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। কঠিন শীতের পরিবেশে দুই দেশের সেনারা আশ্রয়, সেনাশক্তি বাড়ানো এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে অনুশীলন করবেন। এ ছাড়া ট্যাংক ডিভিশন, করোনারি, স্নাইপার টিম, হেলিকপ্টার ও কমান্ডোরা মহড়ায় অংশ নেবেন।

কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন সম্পর্কে
লতিফিয়া উলামা সোসাইটি ইউকের বক্তব্য

সাম্প্রতিক সময়ে কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষার জন্য আবিস্কৃত নতুন ভ্যাকসিন নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিশেষত বৃটেনের মুসলিম কমিউনিটিতে এটি মুসলমানদের জন্য গ্রহণ করা বৈধ কি না এ ধরনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছি। এ বিষয়ে লতিফিয়া উলামা সোসাইটি ইউকের নিকট জানতে চাইলে তারা যে বক্তব্য দিয়েছেন, পরওয়ানা পাঠকের জন্য তা হুবহু তুলে ধরা হলো-

ইউকে সরকারের 'মেডিসিন এন্ড হেলথ কেয়ার প্রোডাক্টস রেগুলেটরী এজেন্সী (MHRA)' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য মতে, ফাইজার কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনে প্রাণী থেকে নেয়া কোন উপাদান ব্যবহার করা হয়নি এবং এ তথ্য বৃটিশ মুসলিম মেডিক্যাল সাইন্স বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত সংগঠন 'ব্রিটিশ ইসলামিক মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (BIMA)' কর্তৃক বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সুতরাং এ ভ্যাকসিন গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য বৈধ হবে এবং তা গ্রহণ করার জন্য আমরা সবাইকে উৎসাহিত করছি।

একইভাবে ইউকে সরকারের 'মেডিসিন এন্ড হেলথ কেয়ার প্রোডাক্টস রেগুলেটরী এজেন্সি (MHRA)' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য মতে, অক্সফোর্ড আস্ট্রা-যেনেকা কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেও প্রাণী থেকে নেয়া কোন উপাদান ব্যবহার করা হয়নি তবে এই ভ্যাকসিনে প্রতি ডোজে ০.০০২ মিলিগ্রাম ইথানল ব্যবহার করা হয়েছে, যা খুবই নগণ্য এবং তা কাউকে প্রভাবিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। এ তথ্যও 'ব্রিটিশ ইসলামিক মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (BIMA)' কর্তৃক বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে নিশ্চিত করা হয়েছে।

যেহেতু জীবন রক্ষা করা শরীয়তের অন্যতম সর্বোচ্চ লক্ষ্য এবং যেহেতু ইথানল এর পরিমাণ খুবই নগণ্য যা প্রভাব বিস্তার করতে অক্ষম সেহেতু এই ভ্যাকসিনও গ্রহণ করা বৈধ হবে।

উপরোক্ত নির্দেশনা বা পরামর্শ কেবলমাত্র Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine এবং Oxford-AstraZeneca COVID-19 Vaccine এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উপরোক্ত নির্দেশনা ও পরামর্শ কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হী ফায়সালা ও উসূলে ফিক্‌হের আলোকে গ্রহণ করা হয়েছে। ভ্যাকসিন গ্রহণ করা বা না করা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে তথাপিও আমরা ভিত্তিহীন প্রোপাগাণ্ডায় কান না দিয়ে কমিউনিটির সকলকে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক ভ্যাকসিন গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে এই মহামারী থেকে উদ্ধার করুন।

বিস্তারিত জানতে নিম্নলিখিত দলীল আগ্রহীগণ দেখতে পারেন:

১। (সূরা বাকারা: ১৭৩) قوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

২। (সূরা আনআম: ১১৯) وقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

৩। (সহীহ মুসলিম: ২০৫১) قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام أو الأدم الخل

৪।

وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه، فشربوا من ألبانها وأبوالها، حتى صلحت أبدانهم. (صحيح بخاري: ٥٦٧٦)

৫।

وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (٦/٣٣) : قال في النهاية: يجوز التداوي بالمحرم كالخمر والبول إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء، ولم يجد غيره من المباح ما يقوم مقامه.

৬। الضرورات تبيح المحظورات. (الأشباه للسيوطي)

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ (চার রং)
৪০,০০০/-

২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ (চার রং)
৩০,০০০/-

ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
১৮,০০০/-

ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
১০,০০০/-

ভিতরের সিকি পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
৬,০০০/-

ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (চার রং)
২৫,০০০/-

ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (চার রং)
১২,০০০/-

ভিতরের এক কলাম ৩" ইঞ্চি (সাদা কালো)
৩,০০০/-

বি. দ্র: একসাথে তিন মাসের জন্য ২৫%, ছয় মাসের জন্য ৩৫% ও এক বছরের জন্য ৫০% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।

যোগাযোগ

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০

ভিজিট করুন

তাসনীম تسنيم
www.tasneembd.org

▼ কুরআন ▼ হাদীস ▼ আকীদা
▼ ইবাদত ▼ প্রবন্ধ ▼ জীবনী
▼ জিজ্ঞাসা ▼ বই

জানার আছে অনেক কিছু

আল কারাউইন বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়। মরক্কোর ফেজ শহরে বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত। ৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে (২৩৭ হিজরি) মরক্কোর ধনাঢ্য বিধাব নারী প্রথমে সেখানে একটি মসজিদ এবং পরবর্তীতে মুসলিমদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি আরবি সাহিত্য, তাসাউফ, চিকিৎসাবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যা পাঠদান করা হতো। আরব-আফ্রিকা-ইউরোপের কয়েক হাজার শিক্ষার্থী কয়েকবছর সেখানে অবস্থান করে জ্ঞানার্জন করতেন এবং সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তেন। আধুনিক চিকিৎসা ও মেশিন নির্মাণের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানই সর্বপ্রথম গবেষণা করেছিলো।

১৯১৩ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসক ফ্রান্স বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করায়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলাম শিক্ষা বন্ধ করা হয়। কালক্রমে সরকারি সহায়তা ও সনদ বিতরণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ-সুবিধা বন্ধ হয়ে যায়। হাজার বছরের গবেষণার লাখো নথি ফ্রান্সকতৃক লুণ্ঠিত হয়।

১৯৫৬ সালে মরক্কো স্বাধীনতা লাভ করলে মরক্কোর বাদশাহ মোহাম্মদ বিশ্ববিদ্যালয়টি আধুনিকায়ন করেন। ইসলাম শিক্ষার পাশাপাশি গণিত, পদার্থ, রসায়ন ইত্যাদি বিষয় সংযোজন করা হয়। ১৯৬৩ সালে বাদশাহ এটিকে মরক্কোর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করেন। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ১১০০ শিক্ষক-কর্মকর্তা এবং ৯ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করেন। সম্প্রতি জাতিসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

মাকড়সা

- পৃথিবীতে মাকড়সার প্রায় ৪০ হাজার প্রজাতি রয়েছে।
- সাধারণত মাকড়সার চোখ ৬ টা। তবে প্রজাতিভেদে চোখের সংখ্যা ৬ থেকে ৮টি হতে পারে।
- প্রায়শই মাকড়সার তৃষ্ণা পায়। এজন্য বাথরুমে ও টিনের চালের পাশে তারা বসবাস করে।
- মাকড়সার পাকস্থলী শুধুমাত্র তরল খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। এজন্য তারা শিকারকে প্রথমে দ্রবীভূত করে চূর্ণ করে এবং পরে গলধঃকরণ করে।
- মাকড়সা প্রতিবছর যুক্তরাজ্যের জনগোষ্ঠীর সমতূল্য অর্থাৎ সাড়ে ছয়কোটির বেশি মাছি ও অন্যান্য পতঙ্গ ভক্ষণ করে।
- মাকড়সার ৮টি পা এবং ১৬ টি হাটু বিদ্যমান
- মাকড়সার শরীর পানিরোধক চুল দ্বারা আবৃত। তাই তাদের শরীর ভিজে না।
- পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় মাকড়সা প্রজাতির গড় ওজন ১৭০ গ্রাম যা একটি মাঝারি বিড়ালের সমান।

*সংকলন: **মোহাম্মদ সিদ্দীক হায়দার***

বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

- ধর্ম-দর্শন, মাসআলা-মাসাইল, ফাদ্বাইল ও আমালিয়াত বিষয়ে লিখুন
- ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, সমসাময়িক, দেশজ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ লেখা পাঠান
- মুসলিম মনীষী, আউলিয়াদের জীবন ও গৌরবময় অতীতের আলোকোজ্জ্বল কাহিনী তুলে আনুন আপনার লেখায়

প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পরবর্তী সংখ্যার জন্য নিম্নোক্ত ই-মেইলে লেখা পাঠাতে হবে

E-mail: parwanabd@gmail.com

পরওয়ানা-এর **গ্রাহক** হওয়ার জন্য **ভাবছেন?**

পরওয়ানার অনুকূলে আপনার নাম ও পূর্ণ ঠিকানা লিখে পাঠান

বার্ষিক চাঁদার হার

বাংলাদেশ	ঃ ৩০০ টাকা
ভারত	ঃ ১৫০০ টাকা
মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশ	ঃ ২০০০ টাকা
যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের সকল দেশ	ঃ ৪০ পাউন্ড/ইউরো
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা	ঃ ৫০ মার্কিন ডলার

এজেন্সির নিয়মাবলি

- ফোন/ই-মেইল/হোয়াটসঅ্যাপ ও অফিসে যোগাযোগ করে চাহিদা জানালে এজেন্সি দেওয়া হয়
- ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না
- প্রত্যেক ৫ কপিতে ১টি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়
- সরাসরি এজেন্টের কাছে পত্রিকা পৌছানো হবে
- আশেপাশের এজেন্টের ক্ষতি হবে না, এমন নিশ্চয়তা থাকতে হবে।
- যেকোনো সময় কর্তৃপক্ষ যে কারো এজেন্টশিপ বাতিল/পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। সেক্ষেত্রে গ্রাহকদের বিকল্প মাধ্যমে পত্রিকা পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে

যোগাযোগ

সার্কুলেশন ম্যানেজার

মাসিক পরওয়ানা

বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০

মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০ (বিকাশ)

বিজ্ঞান

পরওয়ানা ডেস্ক:

সাধারণ কাগজই হতে পারে হিউম্যান পাওয়ার্ড কীপ্যাড

স্মার্টফোন, ট্যাবলেটস, ফিটনেস ট্র্যাকার্স কিংবা হেডফোন; যে ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসের কথাই বলি না কেন, নাম শুনেই মনে হবে প্লাস্টিক, গ্লাস কিংবা এরকম অনমনীয় কোন পদার্থের তৈরি যন্ত্রের কথা। কিন্তু এরকম কি হতেই হবে? না, তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই বলে মনে করেন ম্যারিনা স্যালা দে মেদেইরস। তার গবেষক দলের উদ্ভাবিত ইলেক্ট্রনিক কীপ্যাডের কথাই ধরুন। এ কীপ্যাড চালাতে কোন ব্যাটারির দরকার হয় না। ব্যবহারকারীর স্পর্শ থেকেই এটি প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করতে সক্ষম। সবচেয়ে বড় কথা, উপরোল্লেখিত কোন পদার্থই ব্যবহৃত হয়নি এ কীপ্যাড তৈরিতে, সাধারণ কাগজ দিয়েই বানানো হয়েছে এ কীপ্যাড।

স্যালা দে মেদেইরস পার্ডু ইউনিভার্সিটির একজন প্রকৌশলী। তিনি এবং তার সহকর্মীরা সাধারণ কাগজের এক পাতাকে সাদামাটা ইলেক্ট্রনিক কীপ্যাডে পরিণত করার উপায় খোঁজে পেয়েছেন। দুনিয়া জুড়ে বহু গবেষক দল কাগজভিত্তিক ইলেক্ট্রনিকস নিয়ে কাজ করছেন। কিন্তু এ ডিভাইসটিই হতে যাচ্ছে কাগজের তৈরি প্রথম ডিভাইস, যেটি কিনা নিজে নিজে ব্যবহারকারীর স্পর্শ থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে– কোন ধরনের ব্যাটারি ছাড়াই, আবার নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারে পানি আর ধুলো থেকেও। ন্যানো এনার্জি জার্নালের ডিসেম্ব ২০২০ ইস্যুতে গবেষকগণ নতুন এ আবিষ্কারের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছেন।

বিপ অ্যাপের আকস্মিক উত্থান

মধ্য জানুয়ারিতে হঠাৎ বাংলাদেশি স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের নিকট এমন এক অ্যাপ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যেটি কিছুদিন পূর্বেও বাংলাদেশীদের নিকট একেবারেই অপরিচিত ছিল। হ্যাঁ, তুর্কি মেসেজিং অ্যাপ বিপের কথাই বলছি। তুর্কি প্রতিষ্ঠান তুর্কসেল ২০১৩ সালে উদ্ভাবন করে মেসেজিং অ্যাপ বিপ। তবে এতো দিন এই অ্যাপটি একেবারেই আলোচনার বাইরে ছিল। সম্প্রতি বিপের সমজাতীয় শীর্ষস্থানীয় অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ তাদের গোপনীয়তা নীতিকে কেন্দ্র করে তুমুল বিতর্কিত হলে হোয়াটসঅ্যাপের বিকল্প বিভিন্ন অ্যাপ স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের নজর কাড়তে সক্ষম হয়। এই সুযোগে বিপ নামক তুর্কি অ্যাপটি চলে আসে বাংলাদেশীদের সামনে।

বিশ্বজুড়ে হোয়াটসঅ্যাপের বিকল্প হিসেবে যে সকল অ্যাপ জনপ্রিয়তা অর্জন করে, তার মধ্যে টেলিগ্রাম, সিগনাল ও বিপ উল্লেখযোগ্য। রুশ প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন টেলিগ্রামকে অনেকে সন্দেহের চোখে দেখলেও সিগনালের উপর বেশির ভাগ সাংবাদিক ও অ্যাক্টিভিস্টই আস্থা রাখছেন। সিগনাল মূলত হোয়াটসঅ্যাপেরই এক সহপ্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক নির্মিত একটি অলাভজনক অ্যাপ। জানুয়ারি মাসে হোয়াটসঅ্যাপ বিতর্কের সূত্রে এই অ্যাপটির উপর এতোটাই চাপ পড়ে যে কয়েক বার সিগনালের সার্ভার ডাউন হয়ে পড়ে। এছাড়া পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে তুর্কি অ্যাপ বিপ গ্রহণযোগ্যতা পেলেও বিপের জনপ্রিয়তা প্রধানত মুসলিম বিশ্বেই বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে তো প্লে স্টোরে ৯২ ধাপ এগিয়ে ফেসবুক লাইট, ভাইবার, ইমোর মতো জনপ্রিয় অ্যাপকে ধাক্কা দিয়ে প্রথম স্থান দখল করতে সক্ষম হয় বিপ। (২০ জানুয়ারির তথ্যমতে)

কিন্তু শুধুই কি নিরাপত্তা ইস্যুতে বিপের এই জনপ্রিয়তা অর্জন? আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হতে পারে। কিন্তু একটু গভীরে চিন্তা করলেই বুঝা যায়, বাংলাদেশের মানুষ এর আগে প্রযুক্তি খাতে গোপনীয়তা বা নিরাপত্তার বিষয়গুলোকে কখনোই এতো গুরুত্ব দেয়নি। এবার এরকম হওয়ার পিছনের অন্যতম কারণ– তুরস্কের রাষ্ট্রপতির দফতরে হোয়াটসঅ্যাপের বদলে বিপ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত। এ কথা অনস্বীকার্য, বাংলাদেশের মতো মুসলিম দেশগুলোতে এরদোগানের জনপ্রিয়তা এখন আকাশচুম্বি। ফলে এরদোগানের বিপ অ্যাপ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।

মুসলিম দেশ তুরস্কের তৈরি অ্যাপ এবং তুরস্কের রাষ্ট্রপতি এরদোগান সেই অ্যাপটি ব্যবহার করছেন, এ বিষয়টি বাংলাদেশের স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের উপর যে ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছে, তাতে বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় স্বকীয়তাবোধের বিষয়টি আবারও সামনে চলে আসে। সেই সাথে তথ্যপ্রযুক্তি খাত, বিশেষত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ক্ষেত্রে মুসলিমদের উত্থানকেও নির্দেশ করে।

হোয়াটসঅ্যাপের তুর্কি বিকল্প সফল হলে এই পথ ধরে হয়তো অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিকল্পও মুসলিম বিশ্বে আসতে পরে, এমনটাই মনে করছেন বিশ্লেষকগণ।

বিভিন্ন সময় কাশ্মীর, ফিলিস্তিনসহ মুসলিমদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতে ফেসবুক যেভাবে মুসলিম অ্যাক্টিভিস্টদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে, তাতে ফেসবুক কিংবা ফেসবুকের মালিকানাধীন হোয়াটসঅ্যাপ বা এ ধরনের পশ্চিমা অ্যাপগুলো কখনোই মুসলিমদের জন্য নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু গ্রহণযোগ্য বিকল্পের অভাবে মুসলিম বিশ্ব এখনো এসব অ্যাপের উপরই নির্ভরশীল।

তবে কি বিপ কিংবা এরকম অ্যাপ লড়াইয়ে মূলধারার অ্যাপসমূহের সাথে পারবে? হোয়াটসঅ্যাপের বর্তমান ব্যবহারকারী যেখানে ২০০ কোটির মতো, সেখানে বিপ মাত্র ১০ কোটি ব্যবহারকারী সংখ্যায় শীঘ্রই পৌছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফলে বিপ যে পরিচিতি লাভ করেছে, সেটিকে কাজে লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, ভাইবার প্রভৃতি অ্যাপের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কতখানি সফল হবে, তা এখনই বলা অসম্ভব। তবে বিপ যে আশার আলো ছড়াচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই।

VOICE CHANGE

Voice change চাকরিপ্রার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাইমারি, নিবন্ধন, বিসিএসসহ অন্যান্য পরীক্ষার বিগত বছরের প্রিলিমিনারি প্রশ্ন বিশ্লেষণ করলে Voice এর গুরুত্ব সহজেই বুঝা যায়। আমাদের এ আয়োজনে থাকছে, চাকরির পরীক্ষায় আসা প্রশ্নকেন্দ্রিক Voice এর গুছানো আলোচনা। সাধারণ নিয়ম নয়, কয়েকটি ব্যতিক্রম Rule থাকছে এ আলোচনায়। **Imperative Sentence** দিয়ে শুরু করা যাক।

The passive form of 'Do away with it' (১১তম শিক্ষক নিবন্ধন-১৪) এই বাক্যটি Imperative. Imperative Sentence মূল Verb দিয়ে শুরু হয়। এই বাক্যগুলোর Voice পরিবর্তনের নিয়মঃ

Active : মূল Verb + object যেমনঃ Eat the cake
Passive : let + object + be + v_3 যেমনঃ let the cake be eaten
এবার, Do away with it এর Passive-
let it be done away with
Active : Open the door (১১তম শিক্ষক নিবন্ধন-১৪)
Passive : let the door be opened
কিন্তু বাক্যটি যদি Negative হয় তখন-
Active : Don't + মূল Verb + object
Passive : let not + object + be + v_3
যেমনঃ **Active :** Don't neglect the poor
Passive : let not the poor be neglected

Reflexive pronoun যুক্ত Active কে Passive:
lila fans herself; (১৪তম প্রভাষক নিবন্ধন) বাক্যে herself শব্দটি Reflexive pronoun; Reflexive (Self/selves যুক্ত) pronoun যুক্ত বাক্যগুলোর Voice পরিবর্তনে-
Active : Subject + Verb + Reflexive object
Passive : Subject + Tense অনুযায়ী Auxiliary Verb (be) + V_3 + Reflexive object.
Tense অনুযায়ী অর্থাৎ, Verb টি Present হলে am/is/are
Verb টি Past হলে was/were
যেমনঃ **Active :** Lila fans herself
Passive : Lila is fanned hy herself
Active : He killed himself (প্রাক-প্রাথমিক সহঃ শিক্ষক-১৩)
Passive : He was killed by himself

Reciprocal pronoun যুক্ত Active থেকে Passive:
Reciprocal pronoun হচ্ছে, each other এবং one another; এই pronoun যুক্ত Active কে Passive করতে-
Active : Subject + Verb + Reciprocal object
Passive : Subject + be (am, is, are/was, were) + V_3 + by + Reciprocal object
যেমনঃ **Active :** They love each other
Passive : They are loved by each other
Active : They married each other
Passive : They were married by each other

Quasi passive:

Quasi শব্দের অর্থ half; Quasi-passive মানে half passive; অর্থাৎ sentence টি গঠনগত active হলেও অর্থগত passive; যেমনঃ Rice sells cheap (বাংলাদেশ ব্যাংক সিনিয়র অফিসার-১৫)। বাক্যটির অর্থ- চাল সস্তায় বিক্রি হয়; এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করুন- বাক্যে sell হচ্ছে verb এবং Rice হচ্ছে subject (Active বাক্যগুলোতে subject ই verb সম্পন্ন করে) কিন্তু এই বাক্যটি গঠনগত active হলেও এখানকার subject 'Rice' এর sell (বিক্রি) করার ক্ষমতা নেই; বরং Rice কেই অন্য কেউ বিক্রি করছে। তাই বাক্যটি অর্থগত Passive; এই ধরনের বাক্যকে বলা হয় Quasi-Passive; এদের Voice পরিবর্তনে-

Active : Subject + Quasi passive + complement.
Passive : Subject + is/was + complement + when it + is/was + V_3
যেমনঃ **Active :** Mango tastes sweet
Passive : Mango is sweet when it is tasted
Active : Rice sells cheap (বাংলাদেশ ব্যাংক-১৫)
Passive : Rice is cheap when it is sold

The Golden Rules of Right form of Verbs

Right form of verbs বিষয়টিও চাকরি প্রার্থীদের জন্য crying need; প্রতিটি পরীক্ষায়ই এ বিষয়ে দুই-তিনটি প্রশ্ন থাকে। এখানে আমরা Right form of verb এর অত্যন্ত কৌশুলি আলোচনা করছি-

Rule-01:

Usually, Always, Regularly, Every (Every week/month/year), Sometimes, Occasionally, Normally, Often, Daily, Ordinary, Generally শব্দগুলো বাক্যে থাকলে বাক্যটি Present Simple tense (Sub + V_1 + obj) এর হয়।
*Present Simple এর ক্ষেত্রে Subject টি 3rd person (I, we, you ছাড়া বাকি সব) এবং singular number হলে verb এর শেষে s/es যুক্ত হয়।
*Verb এর শেষে s, ss, sh, ch ('চ' এর উচ্চারণ), o, x, z থাকলে es যুক্ত হয়; অন্যথায় s। যেমনঃ go – goes, invite – invites
উদাহরণঃ I usually (to take) breakfast at 6.30 in the morning. (পানি উন্নয়ন বোর্ড-১৫)
Ans. take
Karim (go) to school
Ans. goes.

Rule-02

ESAN সবসময় 3rd person, singular number হয়। সুতরাং এরা singular verb ও singular pronoun গ্রহণ করে।
E = Everybody, Everyone, each, either, everything
S = Somebody, Someone, Something
A = Anybody, Anyone, Anything
N = Nobody, No one, Neither, Nothing

উদাহরণ:
Every mother loves her children.
choose the correct sentence : (26th BCS)
Everybody have gone there
Everybody have went there
Everybody has gone there
Everybody are gone there
Ans: (c)

সংকলন: মুমিনুল ইসলাম

কবিতা

হযরত আলী (রা.) এর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নসীহত

রুহুল আমীন খান

প্রিয়নবী বলেন, আলী সত্যি তুমি খোদার শের
ওহে আলী প্রতিক তুমি শক্তি সাহস বীরত্বের।
ভরসা তবু করবে না এই বাহুবল ও সামর্থের
বরং সদা থাকবে তুমি সন্নিধানে কামিলদের।
যদি করে ইবাদত ও বন্দেগী কেউ সে সত্তার
ভালোবাসা-মোহাব্বতে যাও এগিয়ে নিকট তাঁর।
ভরসা কেবল করো নাকো নিজ ইবাদত বন্দেগীর
লক্ষ্য রেখো সর্বদায়ী কামিলগণের পায়রবির।
সর্বদা পায়রবি কর কামিল ওলী আল্লা'দের
ভেব না যথেষ্ট কভূ কেবল ইবাদত নিজের।
তাদের উসিলাতে তুমি খোদার নিকটবর্তী হও
অনুকরণ কর এবং সেবায় তাদের লিপ্ত রও।
পারেন তাঁরা ফুল ফোটাতে সকল কাঁটা করতে দূর
মনের আঁধার চোখে তারা, দিতে পারেন দীপ্ত নূর।

ছায়া তাদের বিপুল বিশাল কোহেকাফের ছায়ার ন্যায়
সিমোরগের ডানা তাদের উর্ধ্বে ওড়ার–বিশালকায়।
সত্য পথের সন্ধানীদের দিক-দিশারী যিন্দেগীর
পারেন তাঁরা পৌঁছে দিতে দরবারে খোদ মওলাজীর।
লহ খোদার আনুগত্য, সংগ ওলী আল্লা'দের
হে আলী! তায় সহজ হবে আগান রাহে মনযিলের।

(মসনবী শরীফের কয়েকটি বয়েতের কাব্যানুবাদ)

আন্দোলিত জলপাই

সানাউল্লাহ্ নূরী

উদ্বেলিত শিহরিত আজ তাঁর
অতলান্ত বিশাল হৃদয়
সদয় চক্ষুতে তাঁর আন্দোলিত
এক-আকাশ স্নিগ্ধশ্যাম
জলপাই শাখা।
কণ্ঠে তাঁর উচ্চারিত সৌভ্রাত্রের
উদ্ভাসিত পংক্তিমালা
ওষ্ঠপুটে তাঁর জাগমান
লোহিত সাগর তটের
নিদ্রামগ্ন পুষ্পদল কলি।

বললেন তিনি অশ্রুসিক্ত চোখে:
শোনো বন্ধুরা নগরের
শোনো আত্মজনেরা সবাই
শোনো আমন্ত্রণ নিকট বন্দরের-
আজ ঘোষিত সাধারণ ক্ষমা-
দায়মুক্ত আজ তারা
ছিল যারা বাঁধা একদিন
সন্ত্রাস আর বিভ্রান্তির জটাজালে।

আজ বিজয় নয়
ঘৃণা নয়, প্রতিশোধ নয় কোনো
আজ নির্বাধ স্বাধীনতা সব মানুষের
স্বাধীনতা আজ সব নারী-পুরুষের
দাস এবং ক্রীতদাসেদের।
বাহু প্রসারিত আজ বন্ধুত্বের
মিত্রতার এবং সুমধুর মিলনের।
ঘরে-ঘরে তোমাদের উচ্চারিত
হোক আজ
কেবল শান্তির অনির্বাণ বাণী।

শুনে এই ঘোষণা শান্তির
শুনে ঘোষণা সার্বিক ক্ষমার
ছুটে এলো পলাতক দুঃশাসক দল
আশ্রয় ছেড়ে দুর্গম পর্বত গুহার।

ভয়ার্ত কম্পিত ক্রন্দনশীল
সেই সব জনে
তুলে নিলেন শান্তির দূত
আপনার বুকে।

রচিত হলো তখুনি এক
অনন্য অশ্রুত ইতিহাস
দেখে তাঁর মহিমা অপার

নড়ে উঠলো কংকাল সমাধিতে
বিশ্বজয়ী কাইকাউসের
আর দুর্জেয় আলেকজান্ডারের।

কেননা কখনো দ্যাখেনি তারা
কোনো বিজয় হয়
রক্তপাত ছাড়া
এবং কোনো পতাকা ওঠে
বিনা অস্ত্রাঘাতে-
যে পতাকায় আঁকা শান্তির
সুশীতল জলপাই ছবি
আর ভাসে ছায়া
বুকে তার মুক্তপক্ষ কপোতের।

তোমাকে ভালোবাসি বলে হে জন্মভূমি
মুজাহিদ বুলবুল

তোমাকে ভালোবাসি বলে হে জন্মভূমি
লজ্জার পাহাড় বেয়ে পরাজয়ের জল নেমে যায়...
যে মাটির সুধাঘ্রাণে আনমনা হয়ে ওঠে বিদেশ-বিভুঁই
আজ তার পরতে পরতে খেলে স্বদেশি শকুন!
মুক্তিযুদ্ধ কি তাহলে শুধুই ইতিহাস?

ভীষণ ক্লান্তি নিয়ে বাড়ি ফেরা তৃষিত খোকা
জলের বদলে কেন সবখানে বিষের বোতল
কোমল হৃদয় তার ক্ষত বিক্ষত কেন ঠোকরে ঠোকরে;
যে জাতি মৃত্যু মুঠোয় নিয়ে ছিনিয়ে এনেছিলো স্বাধীনতা
তারা আজ শকুনের মুখ থেকে মানচিত্র বাঁচাতে ভয় পায়!

তোমাকে ভালোবাসি বলে হে জন্মভূমি
এক চোখে জল আর অন্যচোখে দাউ দাউ আগুন;
তোমাকে ভালোবাসি বলেই হে জন্মভূমি
কামানের মুখে থুথু দিয়ে আজও আমি নির্ভয়ে বলতে পারি
চুপ কর দালালের বাচ্চা!

তোমাকে ভালোবাসি বলে হে জন্মভূমি
আমার প্রিয়তমার রঙিন শাড়িটাও সহসা সাদা মনে হয়!
তোমাকে ভালোবাসার চেয়ে বড় আত্মঘাত
আগে আর দেখেনি জীবন।

আলোর নকীব
আখতার হোসাইন জাহেদ

জাহিলিয়াত বোধ হয় ফের এসে গেছে
আলোকোজ্জ্বল পৃথিবী ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসছে
বর্বরতার চরম সীমায় আজ দেশ, জাতি, ধরণী।

জাহিলিয়াতে মদ্যপান ছিল নিছক পানীয়তুল্য
হারাম হওয়া সে রুসুম আবার শুরু হয়ে গেছে
ড্রিংকসের নামে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সে নেশায় আসক্ত।

এদিকে পর্দাপ্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করতে যাচ্ছে আজকের সমাজ
বেপর্দা নারীদের অবাধ চলাফেরা
লেলিয়ে দিচ্ছে নরপিশাচদের।
চারিদিকে ধর্ষণ, খুন-খারাবির যেন চলছে মহোৎসব
ধর্ষিতার গগণবিদারী আর্তনাদ প্রকম্পিত করছে আকাশ বাতাস
রীতিমতো হার মেনে চলছে সেই জাহিলিয়াতি বর্বরতা,
পত্রিকার পাতায় পাতায় এ সকল পাশবিকতার খবর।

এ থেকে উত্তরণে কোনো আলোর নকীব কি আসবে না?
রাসূলের আদর্শের মশাল হাতে হে যুবক,
তোমাকে ফিরে আসতেই হবে।
সিরাতে মুসতাকীম, উসওয়ায়ে হাসানার পথ
তোমাকে দেখাতেই হবে।
তবেই অসুস্থ এ সমাজ ফিরে পাবে সুস্থতা
সকলে গ্রহণ করবে নির্মল নিঃশ্বাস।

নাতে রাসূল ﷺ
সৈয়দা নাদিরা হোসেন

বিশ্বের রহমত হে সরদারে দুজাহান!
তোমারি নামে দানে অনন্ত কল্যাণ।
তোমারি শান করিতে প্রমাণ,
সাক্ষী দিল যে পাথর পাষাণ।
সালাম সালাম নবী হাজারো সালাম
সালাম সালাম লওগো লাখো সালাম।
মরুর গোলাপ হে, সৌরভ ঢালা
তোমারি সুবাসে ভুবন উথলা
তোমারি পায়ের মুবারক ধূল
চায় যে আশিক হইয়া ব্যাকুল।
কী গান গাইলেন হে মদীনার বুলবুল
যে সুর ভাঙ্গিল ধরার মাটির পুতুল।
তোমারি প্রেমে হইয়া মশগুল,
পড়িল কালিমা– মুহাম্মদ রাসূল।
ইসলামের রবি হে, পরশমণি!
বৈষম্য বিভেদে কুঠার হানি,
করিলা ঘোষণা আল্লাহর বাণী
সকল মুমিন ভাই ভাই জানি।
হাশরের ময়দানে নিদানের কালে
সকলি পেরেশান ইয়া নাফসি বলে
তুমিতো সিজদায় নয়নের জলে
করিতে শাফাআত উম্মতী বলে।
পবিত্র কুরআনে তোমারি গুণগান,
হবে না কভু গাহিয়া অবসান।
তোমারি গুণে হই যেন মহিয়ান,
ধারণ করি দিলে হাদীস ও কুরআন
সজীব রাখিতে সদা মোদের ঈমান।

ভালোবাসা
মোখলেসুর রহমান

মায়া-মমতার ধামে ভালোবাসা অন্বেষা
ভালোবাসা প্রেম-প্রবণ নদীর নাম
যার স্রোতে বয়ে চলে সুখ অবিরাম
জন্ম-জন্মাদিতে মজেছে স্রষ্টার ভালোবাসা।

অবাক পৃথিবী সবাক সৃষ্টি ভালোবাসা যতো
প্রেমে মজা জীবন মায়াপূর্ণ সুখে স্মৃতিময়
যদি মমতায় ক্লান্ত হৃদয়টা ভালোবাসাময়
ভালোবাসা পায় একজনই যিনি প্রশংসিত।

নবীদের গল্প

অনুপম আতিথেয়তা

মুহাম্মাদ উসমান গণি

দিনের সূর্যটা নিভে গেছে। অন্ধকারে ঢেকে গেছে পুরো পৃথিবী। স্নিগ্ধ সন্ধ্যা। নবীজি ﷺ বিশ্রাম নিচ্ছেন হুজরা মুবারকে। ঠিক তখন এক মুসাফিরের আগমন। নবীজি ﷺ মুসাফির দেখে খুব খুশি হলেন। তাকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করলেন। লোকটি ছিল ইয়াহুদী। ইয়াহুদী নয় মুসাফির হিসেবেই নবীজি ﷺ তাকে গ্রহণ করলেন। রাতে খাবারের জন্য নবীজি একটি বকরীর দুধ দোহন করে পুরোটাই মেহমানকে দিয়ে দিলে মেহমান পুরো দুধটাই সাবাড় করে দিলেন। নবীজি আরও একটি বকরীর দুধ দোহন করে তার জন্য নিয়ে আসলে সেটিও নিমিষে সাবাড় করে দেন মেহমান। তৃতীয়বার আরও একটি বকরীর দুধ তার সামনে দিলে শেষ করে দেন এক চুমুকেই। খুবই লজ্জার বিষয়। মেহমানকে তো আর উপোস রাখা যায় না। এভাবে নবীজি দুধ নিয়ে আসছেন, আর লোকটি সাবাড় করে যাচ্ছে। একে একে সাতটি বকরীর দুধ পেটে পুরে তার পর থামল লোকটি। নবীজি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। জিজ্ঞেস করলেন, পেটে আর ক্ষুধা আছে কি না। লোকটিও পরম তৃপ্তিতে জানাল তার পেট ভরে গেছে। পেটে আর সংকুলান হবে না। নবীজি তাকে বিছানাপত্র ঠিকঠাক করে দিয়ে বিশ্রাম নিতে বললেন। লোকটি বিছানায় গিয়েছে কিন্তু কিছুতেই তার ঘুম আসছে না। তার হৃদয়ে এক প্রকার অপরাধবোধ কাজ করছে। শুধু বিছানার এপাশ ওপাশ গড়াগড়ি খাচ্ছে। না ঘুমিয়ে বিছানায় বসে বসে চিন্তা করছে। ভাবছে ইচ্ছে করে এ অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করা তার উচিত হয়নি। বার বার পীড়া দিচ্ছে নবীজির সাথে এ ব্যবহারের জন্য। ভাবছে বারবার খাবার চাওয়ার পরেও তিনি কোনো রাগ করেনি। তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি কোনো সাধারণ মানুষ নন। রাত বাড়তে লাগল। গভীর রাতে নবীজি দেখতে বের হলেন, মেহমানের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা। নবীজি লোকটিকে বসে থাকতে দেখলেন। খুব বিনয়ের সাথে জানতে চাইলেন ভাই, কোনো সমস্যা হচ্ছে কী? লোকটি খুব আশ্চর্য হলো। নবীজির উদারতা দেখে নিজের মধ্যেই অনুশোচনা করতে শুরু করল। প্রিয় নবী ﷺ এর মহান আদর্শে মুগ্ধ হয়ে নবীজির কাছে কাতর কণ্ঠে ক্ষমা চাইল। বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি আপনাকে পরম শত্রু মনে করতাম। আপনাকে পরীক্ষা করার জন্যই আজ মেহমান হওয়ার ভান করেছিলাম। কিন্তু আপনার মহান আদর্শের কাছে আমি নতি স্বীকার করে হেরে গেলাম। আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। মুসলমান হয়ে সাধাসিধে জীবন গ্রহণ করল। যে মানুষটি এক সাথে সাতটি বকরীর দুধ সাবাড় করে দিয়েছিল। তিনিই পরবর্তীতে একটি মাত্র বকরীর দুধ খেয়ে কাটিয়ে দিতো পুরো দিন।

গল্প

সোনা মেয়ে

মাহবুবুর রহীম

হাবিবা গত বছর দ্বিতীয় শ্রেণিতে উঠেছে। নিয়মিত লেখাপড়া করে। মা-বাবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে। তবে খেলাধুলার সময় হলে তাকে কিছুই শুনানো যায় না। খেলাধুলার নির্দিষ্ট সময়ও বাঁধা নেই। যখনই খেলার সাথীরা জড়ো হবে তখন তাকে আটকানো মুশকিল। সেদিন স্কুল থেকে মাত্র সে ঘরে ঢুকেছে। তার মা বললেন- হাবিবা, এখন ভাত খাবে। হাতমুখ ধুয়ে এসো। এখন খাবো না, মা। হাবিবার ঝটপট উত্তর।

-কেন খাবে না?

-আমার যে খেলার সময় হয়েছে। সবাই আমার অপেক্ষা করছে। হাবিবার মা অসহায়ের মতো কথাগুলো শুধু শুনতে থাকলেন। এতক্ষণে সে দৌড়ে চলে গেছে বাড়ির উঠানে। প্রায় বিশ মিনিট পরে হন্তদন্ত হয়ে রুমে ঢুকল হাবিবা। টেবিলে রাখা ফিল্টার থেকে যেই পানি নিতে চাইল কাঁচের গ্লাসটি মেঝেতে পড়ে ভেঙ্গে গেল। গ্লাস ভাঙ্গার শব্দে তার মা হাতের কাজ ফেলে দৌড়ে এলেন। তাকে বকাঝকা করার আগেই কাঁচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিতে চাইল সে। মা বললেন- গ্লাস ভেঙ্গেছে, ভাঙ্গুক। এবার এগুলো

কুড়াতে গিয়ে হাত কাটতে হবে না। আমিই টুকরোগুলো কুড়াব। হাবিবা বলল, আমি পানি নিতে গিয়েছিলাম। হাত ফসকে গ্লাসটি পড়ে গিয়েছে, মা।

-তোমার যে কচি হাত, পড়বেই তো। তুমি পানির জন্য আমাকে বলতে পারতে।
-খুব তৃষ্ণা পেয়েছিল মা। তাই নিজেই নিতে চেয়েছিলাম।
-থাক এসব কথা। এখন পানি পান করো আগে। একথা বলে একটি গ্লাসে পানি ঢেলে হাবিবার হাতে দিলেন। সে দাঁড়িয়ে বাম হাতে পানি পান করতে গেল। মা বাঁধা দিয়ে বললেন, বাম হাতে এবং দাঁড়িয়ে পানি পান করা উচিত নয় হাবিবা।
-কেন মা?
-আমাদের নবী ﷺ নিষেধ করেছেন।
-কেন নিষেধ করেছেন, মা?
-নবী (সা.) যা নিষেধ করেন, তা মানতে হয়। নবীর নিষেধ মানে আল্লাহর নিষেধ।
-ওহ, বুঝেছি।
-আল্লাহ এবং নবীর নিষেধ না মানলে তোমার অমঙ্গল হবে, একথা মনে রেখো।

এরপর বসে ডান হাতে পানি পান করতে লাগল হাবিবা। তার মা সবকিছু খেয়াল করছেন। পানি পান শেষ হলে তিনি আবার বললেন, শুনো হাবিবা! আজকের মতো কখনো এক ঢোকে পানি পান করবে না।

-তাহলে কিভাবে পান করব, মা?

-তুমি গ্লাসের সমস্ত পানি তিন বা তার অধিক ঢোকে পান করতে পারো। এক ঢোক শেষে গ্লাসের বাইরে নিশ্বাস ফেলে আবার অন্য ঢোক নেবে। এভাবে প্রতিবার গ্লাসের বাইরে নিশ্বাস ফেলতে হবে।

-কেন মা? এভাবে না করলে কী হবে?

-এভাবে না করলে অনেক ক্ষতি হতে পারে। প্রথমে, তাড়াহুড়ো করে পানি পান করতে গিয়ে গলায় পানি আটকে যেতে পারে। এতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এছাড়া নাক মুখ দিয়ে পানি উঠে যেতে পারে। তাই এভাবে পান খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

-আর গ্লাসে নিশ্বাস ফেললে কী হয়?

-যে নিশ্বাস বাইরে ফেলা হয়, সেটা খুব দূষিত হয়ে থাকে। বিষাক্ত বলা যায়। গ্লাসের ভেতর নিশ্বাস ফেললে সেই বিষাক্ত বায়ু পানির সাথে মিশবে। সেই পানি তুমি আবার পান করবে। এটা স্বাস্থ্যের জন্য খুব ক্ষতিকর।

-বুঝেছি মা। এ কথাগুলো আমার মনে থাকবে। আর আমার বন্ধুদেরকেও তা জানিয়ে দেব।

হাবিবার মা এবার মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, এইতো আমার সোনা মেয়ে। তুমি সহজে সব কথা বুঝো বলেই আমি তোমাকে 'সোনা মেয়ে' বলে ডাকি।

হাবিবা মুখে হাসি ফুটিয়ে তার আম্মাকে জড়িয়ে ধরে বললো, এবার ভাত দাও মা, খুব ক্ষিধে পেয়েছে।

তিহামের একটি ভোর

সাজমিন আক্তার রাহেলা

জুমআর জামাআত পড়িয়ে ইমাম সাহেব ছুটিতে যান। পরদিন শনিবার মক্তব বন্ধ থাকে। এ রীতি চলে আসছে সেই দাদার আমল থেকে। আজ তিহাম মক্তবে যায়নি। এক ঝলক রোদের দেখা পেতে হাঁটতে বেরিয়েছে। বাড়ির সামনে বেরুলে রক্তিম সূর্যের দেখা মিলে। পুবের গাঁয়ের উঁচু শিমুল গাছের মাথায় সূর্য ওঠে। এটা সবখানে সমান নয়। গত বছর তিহাম ফুপুমণির বাড়ি গিয়েছিল। সেখানে সুরমা নদীর ওপারে সূর্য ওঠে। সকালের রোদ মিষ্টি। এটা মিষ্টি হয় কিভাবে? রসনায় না পড়লে তিতা মিঠা জানার উপায় নেই। তবে সকালের রোদের ব্যবহার খুব মিষ্টি। তার দিকে তাকিয়ে থাকলে কোনো অভিমান করে না। গোল বৃত্তের মতো সূর্যটার পরিধি মাপা যায়। কোথাও এর পরিধি আরো ছোট হয়। গত বছর আফনান ভাইয়া সমুদ্র সৈকতে গিয়েছিলেন। সেখানে নানান ভঙ্গিমায় ছবি তুলেছেন। একটি ছবিতে তিনি সূর্যকে হাতের তালুতে নিয়েছেন। বড় হলে সমুদ্র সৈকতে যাওয়া হবে। এখন হাত মেলে পরিমাপ নিতে হবে।

উত্তর-দক্ষিণ বরাবর হাত দুটো প্রসারিত করল তিহাম। বাম হাতে কি যেন লাগল। মাচা থেকে নুয়ে পড়া শিমের লতায় তিহামের হাতের পরশ লাগে। কচি শিমলতা খুব বিপদজনক। ত্বকে লাগলে ঘা হয়ে যায়। এই শিমলতার কারণে বাছির মিয়া চোখ হারিয়েছেন। ছোটবেলায় শিমঝাড়ের পাশ দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিলেন। ঘটে দুর্ঘটনা। গরম সেক তার চোখ ভালো করতে পারেনি। এক সময় পঁচে যায়। এক চোখের টানে অন্যটিরও আলো হারিয়ে যায়। এখন তিনি ভিক্ষা করেন। কানা বাছির নামে পরিচিত। তিহাম নুয়ে পড়া তিনটি শিমলতা বেড়ার ভিতরে ফিরিয়ে দিল।

সকালের সূর্য হাজারও আলোর উৎস। সূর্যের দিকে দৃষ্টি দিয়ে ঘন ঘন তিন চার বার চোখ বন্ধ করলে সে চমক দেখা যায়। সূর্য থেকে

রঙ বেরঙের গোল গোল বৃত্ত ভেসে আসে। ছোট থেকে বড় হয়। আবার মুহূর্তে হারিয়ে যায়। তিহামের কাছে এটা খুবই আনন্দের। ও দিকে মুন্নার মার ছেলেরা সবজি ক্ষেতে পানি দিচ্ছে। একজন খালের পানিতে পা ডুবিয়ে বালতি ভরে দিচ্ছে। বাকি দুজন খালি পায়ে পানি বয়ে নিচ্ছে। কারো গায়ে শীতের পোশাক নেই। তাদের কি ঠান্ডা লাগে না। পাশের বেড়ায় একটি চাদর রাখা আছে। কাজের সুবিধায় সেটিও খুলে রেখে। মুন্নাদের নিজস্ব জমিজমা নেই। আমন ধান কাটা হলে খালি ধানক্ষেতে তারা রবিশস্যের চাষ করে। কোদাল দিয়ে খুড়ে দুতিন বিঘা জমিতে সবজি ফলাতে পারে। কাঁচা মরিচ ও ফরাস ডাল চাষ করেছে। সিলেটের বাইরে ফরাস চাষ হয় না। শুদ্ধ ভাষায় ফরাসের নাম কি, তিহাম জানে না। তবে একবার একটি জাতীয় পত্রিকায় 'ফরাস ডাল' শব্দটি দেখেছে। বোয়াল মাছের সাথে ফরাস ডালের তরকারি তিহামের পছন্দ। প্রতি বছর মুন্নার মা মণ আধেক ফরাস বিচি তিহামদের কাছে বিক্রি করেন। তিহাম ভাবছে, এত স্বাদের তরকারি ফলাতে কতই না শীত সহ্য করতে হয়। তার মনে কি যেন এল। মান্না ডেকে এনে জ্যাকেটটি পরিয়ে দিল। বারবার ফিরে দেখছে তার জ্যাকেট মান্নাকে কেমন দেখায়। গত বছর সাকিবা আপুর বাবা গ্রিস থেকে এটি এনেছেন। কতো দামি জ্যাকেট। ভোরে আম্মু পরিয়ে দিয়েছেন। এখন বাড়ি ফিরলেই বলবেন, জ্যাকেট কোথায়? ঘরে ফিরতে ভয় হচ্ছে। তালগাছের কাটা মুড়ায় বসে রইল সে। সূর্য দেখা গেলেও রোদের উষ্ণতা নেই। খুব ঠান্ডা লাগছে। কিছু আগে মান্নারও একই রকম ঠান্ডা লেগেছিল নিশ্চয়।

হঠাৎ ডাক শুনল, তি-হা-ম। ফিরে দেখল রিদা আসছে। তিহামের একমাত্র বোন রিদা। কিছু বলার আগেই জিজ্ঞেস করল, জ্যাকেট কই? কোনো উত্তর না দিয়ে তিহাম হাত দিয়ে দেখাল। রিদা হেসে দিয়ে বলল, এটা মুন্নার গায়ে! পরশু আমাকে একবার পরতে দেওনি। তিহামের মনে হলো, সে বলবে তোমার কি শীতের কাপড়ের অভাব? কিন্তু বলল না। এখন রিদাকে পক্ষে রাখা দরকার। রিদা বলল, তুমি জানো, আম্মু কি বলবেন? কি আর বলবেন; বলবেন, মুন্নার মার ছেলেদেরকে এসব দিয়ে লাভ কী? কদিন পরে এসে বলবে ইদুরে কেটে ফেলেছে। উত্তর দিল তিহাম। রিদা সমর্থন জানিয়ে বলল, হুম, এটা বলবেন আর কত সময় বকবেন। তবে বকাঝকা থেকে বাঁচার উপায় একটা আছে। রাতে সে ঘুমুতে যাবার সময় দাদু যখন বলবেন, আজকের সেরা ভালো কোনটি। তখন বলে দিব। দাদু খুশি হলে আম্মু কিছু বলবেন না। তবে এর আগ পর্যন্ত বিষয়টি লুকিয়ে রাখতে হবে। রোদ গরম হবার পর বাড়িতে গেলে কেউ জ্যাকেটের খুঁজ করবে না। রিদা, তিহাম এখন রোদ গরম হবার অপেক্ষায়।

[আবাবীল ফৌজের বন্ধুরা! তোমরা যে কেউ পরিকল্পনা করে 'শব্দকল্প', 'বর্ণকল্প', অথবা শিক্ষামূলক 'ছোটগল্প' ও 'ছড়া/কবিতা' লিখে পাঠাতে পারো। অবশ্যই লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলবে। আর মনে রাখবে, প্রত্যেক লেখার কপি রেখে পাঠাতে হবে, কারণ অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না।]

নিয়মাবলি

- আবাবীল ফৌজের সদস্য হতে হলে নির্ধারিত সদস্য কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠাতে হবে।
- ইসলামী ভাবধারার যেকোনো উন্নত মানের শিশুতোষ রচনা এ বিভাগে ছাপা হয়। সর্বোপরি শিশু-কিশোরদের প্রতিভা বিকাশ, তাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধনের জন্যই 'আবাবীল ফৌজ'।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হতে হবে। লেখার সাথে লেখকের পূর্ণ ঠিকানা থাকা চাই।
- বলতো দেখি, শব্দকল্প ও বর্ণকল্পের জবাব ও সমাধান চলতি মাসের ১৬ তারিখের মধ্যেই পত্রিকা অফিসে পৌঁছাতে হবে।
- 'বলতো দেখি'র সঠিক জবাবদাতাদের মধ্য থেকে নম্বরের ভিত্তিতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্ধারণ করে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।
- আবাবীল ফৌজের যেকোনো সদস্যের তৈরি করে পাঠানো শব্দকল্প, বর্ণকল্প মনোনীত ও প্রকাশিত হলে তাকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।
- বর্ণকল্পে অংশগ্রহণকারী সঠিক জবাবদাতাদের নাম- ঠিকানা পরবর্তী সংখ্যায় যত্ন সহকারে ছাপানো হবে।
- A4 কাগজে স্পষ্ট করে হাতে লিখে অথবা কম্পোজ করে আবাবীল ফৌজের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
- ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই আবাবীল ফৌজ ও লেখার শিরোনাম উল্লেখ করতে হবে।
- ই-মেইলের ক্ষেত্রে প্রতিটি লেখা স্বতন্ত্র ফাইল করে মেইলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- প্রতিটি লেখার সাথে নিজের নাম, পূর্ণ ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর, শ্রেণি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে পাঠাতে হবে।

ছড়া/কবিতা

খোশ আমদেদ
মু. ছাদিকুর রহমান শিবলী

তোমার জন্য রয়েছিলাম
ব্যাকুল হয়ে বসে
আসবে তুমি মোদের হাতে
আসলে অবশেষে।

আসছো যখন যেও নাকো
মোদের ছেড়ে তুমি
তোমায় পেয়ে খুশির বানে
ভাসছি দেখো আমি।

খোশ আমদেদ হে পরওয়ানা
আহলান ও সাহলান
তোমার দ্বারা উজ্জ্বল হোক
মুসলমানের মান।

পরওয়ানা
আলিম উদ্দিন আলম

দেশ বিদেশে বাংলা ভাষায়
জাতীয় এ মাসিক
ফুলতলী ছাহেবের স্মৃতিধন্য
আকীদায় সঠিক।

পরওয়ানা পড়তে ভালো
ছড়ায় আলো জ্ঞানের
তথ্যগুলো স্পষ্ট থাকে
দ্বীন-ইসলাম ও বিজ্ঞানের।

২১ সালের ১ জানুয়ারি
খুশি সবাই তাতে
আসলো আবার পরওয়ানা
সবার হাতে হাতে।

ন্যায়-নীতিতে অটুট থাকে
সবার আছে জানা
সাহিত্যের এক বিশাল ভাণ্ডার
মাসিক পরওয়ানা।

একুশ মানে
রেদ্বওয়ান মাহমুদ

একুশ মানে সালাম, রফিক
একুশ মানে বরকতও
একুশ মানে মায়ের ভাষা
নেই দ্বিধাবোধ, তর্ক তো।

একুশ মানে বুকের তাজা
রক্ত দেওয়া রাজপথে
একুশ মানে জিততে শেখা
যতই বাধা মাঝ পথে।

ভাষার তরে বুকের তাজা
রক্তে ভাসা নদী কার?
আমরা হলাম সেই জাতি যে
ছিনিয়ে আনে অধিকার।

দীদারের কাঙ্গাল
জি আর এম জাহাঙ্গীর শাহ

দাও গো মোরে দেখা
ওগো কামলিওয়ালা,
শয়নে স্বপনে এসো
ওগো মদীনাওয়ালা।

তোমার নূরের পরশে
দীপ্ত করো মোর প্রাণ,
গভীর নিশিতে এসে
আঁধার করো অবসান।

তোমার তরে সঁপেছি
আমার এই তনু মন,
দীদার পেলে ধন্য হবে
আমার এই জীবন।

ওগো হাবীব খোদার
আমার মনের বাসনা,
তোমার দেখা পেলে
দূর হবে সকল যাতনা।
আমি তো দীদারের কাঙ্গাল

ওগো দুজাহানের সরদার,
তোমার রওদ্বার কিনারে
ছুটে যায় মন বারে বার।

মাতৃভাষা বাংলা আমার
তানহা জনি

মাতৃভাষা বাংলা আমার
সকল ভাষার সেরা
এই ভাষাতে ভালোবাসার
পরশ থাকে ঘেরা।

বাংলায় আমি কথা বলি
বাংলাতে গাই গান
বাংলা ভাষার অমীয় সুধা
জুড়ায় সবার প্রাণ।

বাংলা ভাষায় কাব্যিকতার
ছন্দ রচেন কবি
এই ভাষাতেই শিশু-কিশোর
ব্যক্ত করেন সবি।

যে ভাষাতে মিষ্টি মেশা
মায়ের মুখের বুলি
সে ভাষাতেই কথা বলি
আমরা পরাণ খুলি।

হে ফুলতলীর ফুল
আহমদ আল আমিন

আমরা তোমায় হারিয়েছি
হে ফুলতলীর ফুল,
তোমার স্মৃতি দহন জ্বালায়
কেঁদে হই ব্যাকুল।

আলিমগণের সূর্য ছিলে
হকের পথে অটল,
আন্দোলনে ডাক দিয়ে
হয়েছিলে সফল।

পাক কুরআনের শুদ্ধ প্রচার
করে গেছো তুমি,
তোমার জন্য ধন্য সবাই
ধন্য সিলেট ভূমি।

বলতো দেখি?

এ সংখ্যার প্রশ্ন

১। উম্মুল কুরআন বলা হয় কোন সূরাকে?
২। বিপ অ্যাপ কোন প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবন করে?
৩। আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস কার উপাধি?
৪। স্পেন বিজয় করেন কে?
৫। তালামীযে ইসলামিয়া কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

গত সংখ্যার উত্তর

১. (ঙ) বা
২. বনু হাশিম
৩. ইমাম সায়্যিদ বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (র.)
৪. সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ (র.)
৫. আবূ হামিদ আল গাযালী (র.)

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম তিনজন পুরস্কৃত]

তাইবা আক্তার চাঁদনী, ক্লাসিক স্কুল এন্ড কলেজ, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # **তানজিনা সিদ্দিকা মারওয়া**, ভাদেশ্বর নাছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, পূর্ব ভাদেশ্বর, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # **শান্ত ইসলাম চৌধুরী,** পুলিশ লাইন্স উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট # **মো. রায়হান হোসেন**, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # **মহিউদ্দিন চৌধুরী**, বুড়িচং, কুমিল্লা # **হা. সেলিম আহমদ কাওছার**, কালিপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, ছাতক, সুনামগঞ্জ # **আশিকুর রহমান**, হাজী মাহমুদ আলী দাখিল মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # **শামছুন নাহার ঝুমা**, হাজী মনোহর আলী এম. সাইফুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়, জুড়ী, মৌলভীবাজার # **জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম**, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # **মো. জাবেল আহমদ**, গ্রাম: দক্ষিণ ভবানীপুর, ডাক: জুড়ী, থানা: জুড়ী, জেলা: মৌলভীবাজার # **মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী**, কমলগঞ্জ সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # **আলী আহমদ নাঈম**, সৎপুর দারুল হাদিস কামিল (এম.এ) মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # **মো. কামরুল হাসান**, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # **রোমান আহমদ**, বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, বরমচাল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # **আলী আসগর**, গ্রাম: দনা বাঙালীপাড়া, ডাক: কানাইঘাট, জেলা: সিলেট # **জাহেদা আক্তার**, রাখাগঞ্জ ডি.কিউ ফাযিল মাদরাসা, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # **আরিফা মেহজাবিন**, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা # **আয়শা ছিদ্দিকা চৌধুরী**, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # **আমিনা আক্তার আরফা**, হযরত শাহজালাল ডি.ওয়াই কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট।

আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই, পরওয়ানা হাতে পেয়ে খুব খুশি হলাম। মনোরম প্রচ্ছদে পরওয়ানা জানুয়ারি সংখ্যা মন কেড়েছে। অনেক অজানাকে জানতে পেরেছি পরওয়ানার মাধ্যমে। পরওয়ানা পরিবারকে ধন্যবাদ।

মারিয়া আক্তার
জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: তোমার খুশিতে আমরাও খুশি। পরওয়ানা পরিবারের পক্ষ থেকে তোমাকেও শুভেচ্ছা।

প্রিয় আন্দালিব ভাই, পরওয়ানা জানুয়ারি সংখ্যা হাতে পেয়েছি। মনে হলো ২০২১ সালের নতুন উপহার। আবাবীল ফৌজের গল্পগুলো পড়ে খুব ভালো লাগলো। বিশেষ করে এয়াকুব আলী চৌধুরীর সোনার চাঁদ অনেক ভালো লেগেছে। এছাড়াও রাহিনের পাখি প্রেম, দাদা ভাইয়ের সাথে বৃক্ষরোপণ ও অহংকারী বটগাছও ভালো হয়েছে।

মুস্তাকিম আহমদ
হযরত শাহজালাল লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: গল্পগুলো তোমার ভালো লেগেছে শুনে আমরা খুশি হলাম। তোমার কাছে বিশেষভাবে এয়াকুব আলী চৌধুরী'র গল্প ভালো লেগেছে। তিনি কিন্তু বেঁচে নেই। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন গুণী সাহিত্যিক ছিলেন। তোমার চিঠির কথা অন্যান্য গল্পের লেখকদেরও জানিয়ে দিলাম। তারা যেন তোমাদের আরও সুন্দর সুন্দর গল্প উপহার দিতে পারেন।

প্রিয় আন্দালিব ভাই, মাসের প্রথমেই পরওয়ানা হাতে পেয়ে কত যে ভালো লেগেছে তোমাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আবাবীল ফৌজের লেখাগুলো খুবই চমৎকার হয়েছে। আশা করি প্রত্যেক সংখ্যায় এরকম মজাদার লেখা উপহার দিবে।

আব্দুল্লাহ আল মুসাদ্দিক
গিয়াসনগর ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

-আন্দালিব ভাই: তোমার ভালো লাগাটা আমাদের কাজকে আরো বেগবান করবে। আবাবীল ফৌজ কিন্তু তোমাদেরই বিভাগ। তোমরাও লিখতে পারবে আবাবীল ফৌজে।

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আবাবীল ফৌজে একসময় হাসতে জানি একটি বিভাগ ছিল। যাতে খুব মজাদার কৌতুক ছাপা হতো। সে বিভাগটি যেন হারিয়ে গেলো। এ বিভাগটি চালু করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

সাবিহা সুলতানা
বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা

-আন্দালিব ভাই: তোমার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। তোমার দাবির প্রেক্ষিতে হাসতে জানি বিভাগ কিন্তু চালু হয়ে গেলো। এবার খুশিতো? পড়ে কতটুকু হাসি পেয়েছে তা কিন্তু লিখে জানাতে ভুলবে না।

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি নবম শ্রেণিতে পড়ি। পরওয়ানার সাথে আমার নতুন পরিচয় হলো। সংখ্যাটি অসাধারণ হয়েছে। আবাবীল ফৌজের লেখাগুলো খুবই চমৎকার লেগেছে। চারটি গল্প, চারটি কবিতা, শব্দকল্প ও বর্ণকল্প সব মিলিয়ে অসাধারণ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এরকম সুন্দর জিনিস উপহার দেওয়ার জন্য।

কামরান আহমদ
ছকাপন উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

-আন্দালিব ভাই: তোমাকে পরওয়ানা পরিবারে স্বাগতম। তোমাদের অংশগ্রহণ নিয়মিত হলে অবশ্যই এরকম নিত্য নতুন বিষয় নিয়ে প্রতি মাসে হাজির হবো তোমাদের কাছে। চিঠির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

[বন্ধুরা! আবাবীল ফৌজে তোমাদের যেকোনো অনূভূতি ও দাবি জানিয়ে লিখতে পারো আন্দালিব ভাই সমীপে। চিঠি লিখে parwanaafbd@gmail.com *এ পাঠিয়ে দিতে পারো। ছাপা হবে আগামী সংখ্যায়।]* -আন্দালিব ভাই

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: ----------

পিতা/অভিভাবক: ----------

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ---------- শ্রেণি: ----------

গ্রাম: ---------- ডাক: ----------

থানা: ---------- জেলা: ----------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

সুপ্রিয় বন্ধুরা

আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো। আর ভালো থাকাই আমাদের প্রত্যাশা। তোমাদের প্রিয় মাসিক পরওয়ানা হাতে পেয়ে খুব আনন্দিত তাই না? তোমাদের মধ্যে যারা নিয়মিত গ্রাহক তারা ঝকঝকে পরওয়ানা ও সাথে চকচকে ক্যালেন্ডার পেয়ে আশাকরি খুশি হয়েছো। তোমরা খুশি থাকলে আমরা অনুপ্রাণিত হই।

ফেব্রুয়ারি মাস বাঙালী জাতির জন্য এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। ১৯৫২ সালে বাংলাকে মাতৃভাষা স্বীকৃতির দাবিতে রফিক, সালাম, বরকত ও আব্দুল জব্বারসহ প্রাণ দিয়েছিলেন নাম না জানা আরো অনেকে। তাঁরা শহীদ হয়েছেন বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্রতা রক্ষায়। তোমাদেরকেও মাতৃভাষা চর্চায় এগিয়ে আসতে হবে।

নিশ্চয়ই নতুন বই হাতে পেয়েছো। নতুন বই পেয়ে আনন্দে কাটছে তোমাদের সময়। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য এখনও ফিরতে পারোনি ক্যাম্পাসে। কারণ করোনার ভয়াল থাবা থেকে পৃথিবী মুক্তি পায়নি এখনও। স্কুল মাদরাসা বন্ধ থাকলেও পড়াশোনা কিন্তু চালিয়ে যেতে হবে রুটিন মাফিক। যাদের অনলাইন ক্লাস হয় বা অ্যাসাইনমেন্ট ভিত্তিক ক্লাস চলছে, অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে তোমাদের নির্ধারিত পাঠচক্রে। বাসায় নতুন বইগুলো পড়ে এগিয়ে রাখতে হবে আগে থেকেই। যেন প্রতিষ্ঠান খোলার সাথে সাথেই তুমি এগিয়ে থাকতে পারো অন্যদের তুলনায়। অন্যদিকে শীতের প্রকোপে সর্দি, কাশিও বেড়েছে অনুপাতিক হারে। সে হিসেবে তোমরা কিন্তু সাবধানে থেকো। সর্দি, কাশি যেনো তোমাদেরকে কোনোভাবেই কাবু করতে না পারে।

পরওয়ানায় তোমাদের অনেকেরই লেখা পৌঁছেছে। যারা লেখা পাঠিয়েছো তাদেরকে পরওয়ানা পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। যারা এখনও লেখা পাঠাওনি দেরি না করে চট-জলদি পাঠিয়ে দাও তোমার লেখাটি।

বন্ধুরা! আগামী মাস কিন্তু স্বাধীনতার মাস। সে হিসেবে স্বাধীনতা নিয়ে তোমাদের লেখা চাই। ছড়া, কবিতা ও ছোটগল্প লিখতে পারো তুমিও।

আজ এ পর্যন্তই। তোমরা ভালো থেকো। তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। এ কামনা করে আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি।

শুভেচ্ছাসহ
তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

শব্দকল্প

১	২	■	৩		৪
■	৫	৬		■	
৭	■		■	৮	
৯			■		■
	■		■	১০	১১
১২			■	১৩	

সূত্র : পাশাপাশি

১। হস্তি, গজ ৩। প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা, নিবারণ ৫। স্লোগান, শোভাযাত্রা ৮। বিয়ের পাত্র ৯। আবশ্যক বা অবশ্যই পালনীয় এর আরবী প্রতিশব্দ ১০। ভূষণ, বেশ ১২। যার নিজস্ব কোনো আকৃতি নেই, কিন্তু আয়তন আছে এবং পাত্রের আকার ধারণ করে ১৩। ইমারত তৈরিতে আবশ্যকীয় মৌলিক উপাদান বিশেষ।

সূত্র : উপর-নীচ

২। স্তন্যপায়ী/সামুদ্রিক জন্তুবিশেষ ৩। গোষ্ঠী ৪। অস্থায়ী, বিনাশ আছে এমন ৬। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে অন্য কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত এলাকা ৭। চিহ্ন এর আরবী ৮। বৃহদাকার গাছের আকৃতি সংকুচিত করে পাত্রে রোপন করার জাপানি পদ্ধতি ১১। তালগোল পাকিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়া।

গত সংখ্যার সমাধান

মা	ন	ব	তা	■	জা	ম
হ	■	ন্দ	■	আ	যা	ন
ফি	কি	র	■	ম	■	ন
ল	তা	■	অ	পা	র	■
■	ব	সু	ন্ধ	রা	■	চা

গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী
আতিকুর রহমান সাকের
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
দারুল হিকমাহ একাডেমি কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

শব্দকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

তাহিয়াত মাহবুবা, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # তাইবা আক্তার চাঁদনী, ক্লাসিক স্কুল এন্ড কলেজ, উপশহর, সিলেট # মাহবুবা জামান, মীরপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ # তানজিনা সিদ্দিকা মারওয়া, ভাদেশ্বর নাছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, পূর্ব ভাদেশ্বর, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # আয়শা ছিদ্দিকা চৌধুরী, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # আমিনা আক্তার আরফা, হযরত শাহজালাল ডি.ওয়াই কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট।

বর্ণকল্প

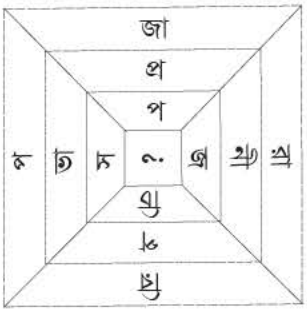

বর্ণগুলো এলোমেলো আছে। এগুলো সাজিয়ে কেন্দ্রের ফাঁকা ঘরে একটি মাত্র বর্ণ বসালে চারটি অর্থবোধক শব্দ তৈরি হবে। চেষ্টা করে দেখতো অর্থসহ শব্দ চারটি তৈরি করতে পারো কি না! সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।

গত সংখ্যার সমাধান

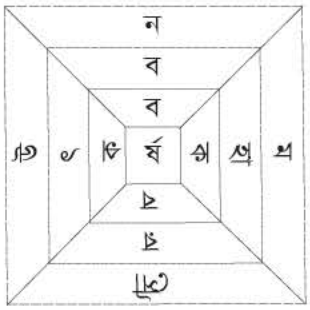

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের পরিকল্পনাকারী
শেখ বিলাল আহমদ
শিক্ষক, মদিনা একাডেমি, উপশহর, সিলেট

বর্ণকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

তাহিয়াত মাহবুবা, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মো. রায়হান হোসেন, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # আশিকুর রহমান, হাজী মাহমুদ আলী দাখিল মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # শামছুন নাহার ঝুমা, হাজী মনোহর আলী এম. সাইফুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়, জুড়ী, মৌলভীবাজার # রোমান আহমদ, বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, বরমচাল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মো. নাঈমুর রহমান, সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট # তাইবা আক্তার চাঁদনী, ক্লাসিক স্কুল এন্ড কলেজ, উপশহর, সিলেট # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মুদ্দাচ্ছির আলী আল-আমীন, হাউসা, বলাউড়া বাজার, সিলেট সদর, সিলেট # মীর নুসরাত জান্নাত মারওয়া, উত্তর কুলাউড়া উচ্চ বিদ্যালয়, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # ফাহমিদা জান্নাত মমো, উত্তর কুলাউড়া উচ্চ বিদ্যালয়, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মাহবুবা জামান, মীরপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ # মো. কামরুল হাসান, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # তানজিনা সিদ্দিকা মারওয়া, ভাদেশ্বর নাছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, পূর্ব ভাদেশ্বর, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # জাহেদা আক্তার, রাখাগঞ্জ ডি.কিউ ফাযিল মাদরাসা, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # আয়শা ছিদ্দিকা চৌধুরী, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # আমিনা আক্তার আরফা, হযরত শাহজালাল ডি.ওয়াই কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মহরম আলী, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

হাসতে জানি

ভাগ্যিস আমি জামার ভেতর ছিলাম না

এক রাতে নাসির উদ্দিন হোজ্জা দেখলেন বাগানে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। চোর ভেবে হোজ্জা ধনুক বের করে চোরের দিকে তীর ছুড়লেন। পরদিন সকালে গিয়ে দেখেন তারই জামা মেলে দেওয়া ছিল সেখানে। যেটাকে হোজ্জা চোর মনে করে তীর ছুড়েছিলেন এবং সেই তীর তারই জামায় বিদ্ধ হয়ে আছে।

সাথে সাথে হোজ্জা মুনাজাত করে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেন।

হোজ্জার স্ত্রী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে মুনাজাত করার কী আছে?

হোজ্জার উত্তর, ভাগ্যিস জামার ভেতর আমি ছিলাম না।

দাওয়াত খেয়ে আসলাম

মালিক: আমাদের দোকানে যে পঁচা ডিম ছিলো সেগুলো কে নিল?

কর্মচারী: রহমান সাহেব।

মালিক: আর মেয়াদ শেষ হওয়া সেমাইগুলো?

কর্মচারী: সেগুলোও রহমান সাহেব নিয়ে গেছেন।

মালিকের কাপাল থেকে ঘাম ঝরছে। কর্মচারী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো- স্যার, আপনার কি শরীর খারাপ?

মালিক: না, মানে একটু আগে স্বপরিবারে রহমান সাহেবের বাসা থেকে দাওয়াত খেয়ে আসলামতো তাই...

আবাবিল ফৌজের সদস্য হলো যারা

৩০০১. মাহবুবা জামান
পিতা: হা. মো. আসাদুজ্জামান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: মীরপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: নজিপুর
ডাক: এবি কাপন
থানা: জগন্নাথপুর
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০০২. জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম
পিতা: মস্তফা উদ্দিন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সদর, সিলেট

৩০০৩. তাহিয়াত মাহবুবা
পিতা: জমির উদ্দিন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সদর, সিলেট

৩০০৪. ফারহাশ ইমতিয়াজ চৌধুরী
পিতা: সূফী মো. এখলাছুর রহমান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হলিয়ারপাড়া হাফিজিয়া সুন্নিয়া ফাযিল মাদরাসা
গ্রাম: জালালাবাদ
ডাক: শাহারপাড়া
থানা: জগন্নাথপুর
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০০৫. আবূ তাহের
পিতা: মখলিছ মিয়া
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা
গোলাপগঞ্জ, সিলেট

৩০০৬. মো. নাসির উদ্দিন তালহা
পিতা: আব্দুস সামাদ আজাদ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: দ্বীনি সিনিয়র আলিম মডেল মাদরাসা
গ্রাম: আলীপুর
ডাক: ফতেহপুর
থান: বিশ্বম্ভরপুর
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০০৭. আজিম উদ্দিন মাসুম
পিতা: আব্দুস সামাদ আজাদ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: দ্বীনি সিনিয়র আলিম মডেল মাদরাসা
গ্রাম: আলীপুর
ডাক: ফতেহপুর
থান: বিশ্বম্ভরপুর
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০০৮. মো. মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী
পিতা: মো. আশিক মিয়া
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: কমলগঞ্জ সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: বড়গাছ
ডাক: কমলগঞ্জ
থানা: কমলগঞ্জ
জেলা: মৌলভীবাজার

৩০০৯. শাকিব আহমদ নাহিদ
পিতা: মাওলানা আলা উদ্দিন আহমদ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: আব্দুল মান্নান হাফিজিয়া মাদরাসা
গ্রাম: গহরপুর
ডাক: পীরপুর বাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০১০. রোমান আহমদ
পিতা: মাসুক মিয়া
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: উসমানপুর
ডাক: বরমচাল
থানা: কুলাউড়া
জেলা: মৌলভীবাজার

৩০১১. সাদিয়া আক্তার ঝুমা
পিতা: হাফিজ মো. আব্দুল মান্নান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: মাইজপাড়া দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: বর্ষিজোড়া
ডাক: মৌলভীবাজার
থানা: মৌলভীবাজার
জেলা: মৌলভীবাজার

৩০১২. তানজিনা সিদ্দিকা মারওয়া
পিতা: হাফিজ মো. আব্দুল কাইয়ুম
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ভাদেশ্বর নাছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ
গ্রাম: পূর্বভাগ, ফকিরটুল
ডাক: পূর্ব ভাদেশ্বর
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩০১৩. মো. কামরুল হাসান
পিতা: মাওলানা মো. ছমর উদ্দিন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: কটালপুর
ডাক: সড়কের বাজার
থানা: কানাইঘাট
জেলা: সিলেট

৩০১৪. মো. পারভেজ মোশাররফ
পিতা: লাল মিয়া
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: সৎপুর দারুল হাদিস কামিল মাদরাসা
গ্রাম: বড়কাপন
ডাক: বড়কাপন বাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০১৫. মুত্তাকিন আহমদ রাহাত
অভিভাবক: আব্দুস সালিক
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা
সোনারপাড়া, শিবগঞ্জ, থানা: শাহপরাণ, সদর, সিলেট

৩০১৬. মো. রেজুয়ান হোসেন অলিদ
পিতা: হাজী আব্দুল মছব্বির
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: দশঘর এন ইউ উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: নোয়াগাঁও
ডাক: দশঘর
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

৩০১৭. শান্ত ইসলাম চৌধুরী
পিতা: মৃত জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: পুলিশ লাইন্স উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট
গ্রাম: গণিপুর
ডাক: শরীফগঞ্জ
থানা: জকিগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩০১৮. সৈয়দ বাকী বিল্লাহ জালালী
পিতা: মাওলানা সৈয়দ আব্দুল কাদীর বেলালী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদরাসা
গ্রাম: মনরাজ
ডাক: পৃথিমপাশা
থানা: কুলাউড়া
জেলা: মৌলভীবাজার

চিঠিপত্র

আপনার সন্তান কোথায় যাচ্ছে?

সহশিক্ষা পদ্ধতিতে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের অবাধ চলাফেরা কিংবা আধুনিকতার নামে কিশোর কিশোরীদের মেলামেশা কতটুকু শোভনীয় ও নিরাপদ। এ বিষয়ে ভাবতে হবে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এসবের ফলে বাড়ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার। কিশোর গ্যাং তৈরি করে ছেলেরা অভিনব অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। জনপ্রিয়তার লোভে মেয়েরাও ক্ষুদে ভিডিও তৈরিতে কিশোর বন্ধুরদের সঙ্গ দিচ্ছে। যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনৈতিক পথে পা বাড়িয়ে প্রাণনাশের স্বীকার হচ্ছে। সম্প্রতি এ ধরনের একটি লোমহর্ষক ঘটনা দেশের সুশীল সমাজকে ভাবিয়ে তুলেছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এক্ষেত্রে অভিভাবকের সচেতনতার অভাব রয়েছে। তাই সন্তানদের বাড়ি ফেরার জন্য সময় বেঁধে দেওয়া নয়, বিদ্যালয়ে পাঠকালীন সময়ের বাইরে তারা আড়ালে আবডালে কি করছে এসব বিষয়ও খেয়াল রাখা জরুরি। কেবল দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা নয়, সন্তানদেরকে নৈতিক শিক্ষায় গড়ে তুলতে হবে। কঠোর আইন প্রয়োগ নয়, নৈতিক মূল্যবোধই অপরাধ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র হাতিয়ার।

মোহাম্মদ আল আমীন ফরহাদ
সারপার, বিয়ানীবাজার, সিলেট

ওয়াজ মাহফিলকে বিনোদনের মঞ্চ বানাবেন না

ওয়াজ মাহফিল বা জলসা বাংলাদেশের ধর্মীয় সংস্কৃতির অংশ। আবহমান কাল ধরে সূফী ও আলেমগণ এধরনের মাহফিলের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করে আসছেন। অধুনা কিছু মাহফিল হতে দেখা যায়, যেখানে চলে ঈমান, আকিদা ও আমলের বাইরে অনর্থক আলোচনা। কোনো কোনো বক্তা ব্যক্তিগত সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে সময় পার করেন। কেউবা যিকিরের নামে গান গেয়ে, নানা অঙ্গভঙ্গি করে শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন। যা মাহফিলের ভাবগাম্ভীর্যকে নষ্ট করে। বিশেষ করে ওরস মাহফিলের নামে নাচ গানের যে আসর বসে তা যেন যাত্রাপালার আধুনিক রূপ। এ ধরনের অনুষ্ঠানে প্রায়ই বিকৃত রুচির শ্রোতাদের ব্যাপক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়, তারা বড় অঙ্কে চাঁদাও দিয়ে থাকেন এবং এটাকে তারা বিনোদনের বিকল্প মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেন। সুশীল সমাজের অনেকেও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন, তাঁরা কী পাপের অংশীদার হবেন না? অনুগ্রহপূর্বক ওয়াজ মাহফিলের ঐতিহ্য রক্ষা করুন। রঙ্গমঞ্চ নয়, ওয়াজ মাহফিল যেন হয় হিদায়তের শামিয়ানা।

মাহফুজুর রহমান জাবের
শিক্ষার্থী; সৎপুর দারুল হাদিস কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট

পাঠকের প্রতি,

আপনার চারপাশের প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যা নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠি লিখে chitipatra.parwana@gmail.com-এ পাঠিয়ে দিন।

...বিভাগীয় সম্পাদক

মুরশিদে বরহক, উস্তাযুল উলামা
হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী'র নিকট হতে
দালাইলুল খায়রাত শরীফের
সনদ গ্রহণ
মাহফিল
২২ ফেব্রুয়ারি'২১
সোমবার, সকাল ১০টা
স্থান:
ফুলতলী ছাহেব বাড়ি
জকিগঞ্জ, সিলেট
দালাইলুল খায়রাত শরীফের সনদ বিতরণ বাস্তবায়ন কমিটি
ফুলতলী ছাহেব বাড়ি, জকিগঞ্জ, সিলেট